প্রথম আলো

ব্লগ

ঈদ সংখ্যা

২০১১

একটি

প্রথম আলো ব্লগ

প্রকাশনা

প্রথম আলো ব্লগ

ঈদ সংখ্যা ২০১১

সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা

ঈদ-উল-ফিতর ২০১১ উপলক্ষ্যে প্রথম আলো ব্লগের একটি ইলেকট্রনিক প্রকাশনা

প্রচ্ছদ: ব্লগার ট্যাশগরু

ই-বুক তৈরীতে কারিগরি সহায়তা: ব্লগার ট্যাশগরু ও ব্লগার সকাল

প্রথম আলো ব্লগ
ঈদ সংখ্যা ২০১১

ব্লগ সঞ্চালকের কথা

সুপ্রিয় ব্লগার,

শুভেচ্ছা। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এবারের ই-বইয়ের ঘোষনা এবং ব্লগারদের লেখা দিয়ে অংশগ্রহণ সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। ঘোষনার পরেই অনেক লেখা এসেছে ই-মেইলে আবার অনেকে লেখার লিংক দিয়েছেন পোস্টের মাধ্যমেও। তবে সময় স্বল্পতার কারণে এবং দ্রুততার সাথে ই-বইটি বের করার লক্ষ্যে সব ব্লগারদের লেখা এ ই-বইয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। এ জন্য আমরা আন্তরিক ভাবে দু:খিত। তবে আবারও ব্লগারদের লেখা নিয়ে শিঘ্রই ই-বই বের করা হবে। আমরা আশা করি তখন আরো বেশি ব্লগারদের অংশগ্রহণে ই-বই সমৃদ্ধ হবে। সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা।

ব্লগ সঞ্চালক
প্রথম আলো ব্লগ
moderator@prothom-aloblog.com

সূচিপত্র

সময়ের কথা- রুবাইয়াৎ আহমেদ: মাটির ময়না মাটির ঘরে

ছবি- মোহাম্মদ ইলিয়াস চৌধুরী: দূরন্ত পারাপার

কবিতা- ফারাবী: একটি ভালোবাসার কবিতা

কবিতা- কালপুরুষ: অতিমানবী

কবিতা- তুহিন সরকার: ভালোবাসা

কবিতা- মো. মুজিব উল্লাহ: স্মৃতির জানালায়

কবিতা- কে এম ওমর ফারুক: স্মৃতির ভালোবাসা

কবিতা- প্রাজ্ঞজন: বৃষ্টি মানে

ছড়া- মাহফুজ মেহেদী: দাম বাড়ে

প্রবন্ধ-বিকাল: সনেট: জন্ম ও ক্রমবিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে প্রধান বিবেচ্য বিষয় ও সহজবোধ্যতা

গল্প- মৃন: শূন্য

ছবি- সালেহ উদ্দিন উজ্জল: দূরন্তপনা

গল্প- আব্দুল্লাহ আল মামুন: ঈদের পেছনের ঈদ

গল্প- ইরতিয়ায দাস্তগীর: প্রধান মালীর গল্প

গল্প- মোহাম্মদ ইলিয়াস চৌধুরী: আংটি: একটি ভালোবাসার গল্প

চিঠি- মঞ্জুরুল হক: বাবার কাছে খোলা চিঠি

প্রবন্ধ- নেটপোকা: যুগের মুসলিম সভ্যতার কালজয়ী নিদর্শন: ক্যালিগ্রাফী বা লিপিকলা

গল্প- রিপন ঘোষ: বাইসাইকেল

গল্প- নষ্টকবি: দু:স্বপ্ন

ছবি- মোহাম্মদ ইলিয়াস চৌধুরী: শরৎ

সূচিপত্র

গল্প- মাহবুব আশরাফী: ঈদ মানে কী, খুব জানতে ইচ্ছে হয়!

গল্প- রুদ্র মিজান: একটি আংটি এবং...

জীবনের কথা- বিন আরাফান: আমার স্ত্রী মা হয়েছে

স্মৃতিচারণা- নাসির আহমেদ কাবুল: দুই রাজাকারের শাস্তি

গল্প- জহিরুল ইসলাম: তিতলির পরি বন্ধু

গল্প- তৌহিদ উল্লাহ শাকিল: রুবিনার ঈদ

গল্প- আমিনুর রহমান: ঈদের আনন্দ

গল্প- সাইফ সাইমুম: অশ্রুস্নাত ঈদ

মাটির ময়না মাটির ঘরে

রুবাইয়াৎ আহমেদ

অকস্মাৎ এক বেদনা ঘনিয়ে এসেছে আমাদের আকাশে। তার জন্য পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না কোনো, তা থাকার কথাও নয়। তবু পার্থিব বাস্তবতা এই, আমাদের শিল্পভূগোল থেকে চলচ্চিত্র চিত্রনির্মাতা তারেক মাসুদকে ছিন্ন করে নিয়ে গেছে কাল। যে যাত্রায় তাঁর অন্তর্ধান, সেই একই পথ পাড়ি দিয়েছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও চিত্রগ্রাহক মিশুক মুনীর। তাঁদের সঙ্গী হয়েছেন আরও তিনজন।

যে যায়, তার সর্বস্বটুকুই তো খোয়ায়। প্রতিটি প্রয়াণের সঙ্গেই আকাশ ভারী হয় দীর্ঘশ্বাসে, পৃথিবীর জল খানিকটা বেড়েও তো যায় অগণিত মানুষের ক্রন্দনে! তাঁদের সবার অকাল প্রস্থান চিরকালীন এক শোকচিহ্ন হয়ে থাকবে আমাদের মনে, যারা জীবিত এখনো।

দুই.
চলচ্চিত্রের প্রতি একজন অনুরক্ত হিসেবে তারেক মাসুদের কাজের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে আমার। প্রায় কৈশোর-উত্তীর্ণকালে তাঁর মুক্তির গান চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে পরিচয়ের সূত্রপাত। আজ অবধি রানওয়েতে এসে সেটি স্থিত হয়েছে। কিন্তু কাগজের ফুল নিয়ে ওড়ার সুযোগটুকু আর পাওয়া গেল না। গত ১৩ আগস্ট তিনি পাড়ি জমালেন চিরঘুমের দেশে, কালো পিচঢালা নির্দয় পথে ঘাতক যান তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে নিল। তারেক মাসুদের মাটির ময়নাটি আশ্রয় নিল মাটির ঘরে।

ভীষণ বড় ওই মানুষটির সঙ্গে কয়েকবার টেলিফোন আলাপ ছাড়া সরাসরি যোগাযোগ হয়নি কখনো। নেত্রকোনা সাহিত্য সমাজ প্রতিবছর বসন্তকালীন সাহিত্য উৎসবের আয়োজন করে। ওই উৎসবের এক আসরে তিনি উদ্বোধক হতে সম্মত হয়েছিলেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের ভার পড়ে আমার ওপর। আর এ কারণেই ওই প্রাণবন্ত মানুষটির সঙ্গে আলাপের অর্থাৎ সংযোগের সূচ্যগ্র অভিজ্ঞতাটুকু আমার সঞ্চয়ে রয়ে গেছে। আকস্মিক ব্যস্ততার কারণে শেষ পর্যন্ত তিনি আমাদের আয়োজনে সশরীরে অংশ নিতে পারেননি। কিন্তু তারপরও তিনি ছিলেন আমাদের সমগ্র আয়োজনের শুভার্থী হয়েই। বিনয়ী ওই মানুষটি কতভাবে, কত সংকোচে যে তাঁর ওই অপারগতা প্রকাশ করেছেন! অঙ্গীকার করেছিলেন, কোনো একদিন যাবেন নিশ্চয় আমাদের নেত্রকোনায়। তিনি রেখেছেন তাঁর দেওয়া কথা, আজ ঠিকই তো তিনি নেত্রের কোণে জল হয়ে ঠাঁই করে নিয়েছেন!

তবু সরাসরি সংযোগের বাতাবরণ ভেদ করে তাঁর সঙ্গে ভিন্ন যোগাযোগ ছিল। সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমার মতো অগণিত মানুষের সঙ্গেই তিনি যুক্ত থেকেছেন। সেই সম্বন্ধ তো শিল্পের, স্বার্থরহিত যথাযোগ্য সম্বন্ধ।

তিন.

তারেক মাসুদের অন্তর্জৈবনিক আখ্যানের শিল্পরূপ মাটির ময়না। আমাদের জাতীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণের চিত্ররূপ এই চলচ্চিত্রটি। সীমার মধ্য দিয়ে অসীমের ব্যাপ্তির মতোই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আগের কয়েক বছরকে তিনি সেলুলয়েড ভার্সনে তুলে ধরেন। কতিপয় চরিত্রের দোলাচলে আর নির্বাচিত দৃশ্যবিন্যাসে বিশাল এই জনপদের ঐতিহ্য, ধর্ম, পারিবারিক ব্যবস্থা, প্রকৃতি, রাজনীতি আর ভৌগোলিক চারিত্র্য যেন বা উঠে আসে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই। কিন্তু সেই উঠে আসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় তারেকের গন্তব্য। তিনি দর্শকের ভেতরে নানা ভাবনার, নানা জিজ্ঞাসারও জন্ম দিয়েছেন। এতে করে পরিণত মানুষ নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাজ্ঞতা অর্জন করে ফেলে যেন বা চলচ্চিত্রটি অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে, সেই প্রশ্নগুলোর মধ্যে ইতি-নেতির দ্বন্দ্বও রয়েছে। কিন্তু কোনো উত্তর নেই। প্রকৃত অর্থে নির্মাতা তারেক কোনো উত্তর দিতে চাননি। কেননা তাঁর উপস্থাপনা কৌশলের ভেতরই রয়েছে উত্তরের খোঁজ। শিল্পে এই গুপ্ত কিংবা খানিক আভাস অথবা রহস্যময়তাই জিয়নকাঠি। নয়তো সব দৈনন্দিন।

চার.

একটি মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের প্রাত্যহিক কর্মকৃত্য দিয়ে মাটির ময়না চলচ্চিত্রটির যাত্রারম্ভ। শীতের কোনো এক ভোরে শিক্ষার্থীদের অজু ও শিক্ষাগ্রহণের মধ্য দিয়ে ক্রমশ অতীতচারী কৌশলে এগিয়ে যায় এর কাহিনিপরম্পরা। এই মাদ্রাসার শিক্ষার্থী আনু নামের এক কিশোরকে কেন্দ্র করে এর ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়। আমরা দেখতে পাই, একই সকালে মাদ্রাসায় পাঠগ্রহণরত আনু আর তারই পরিবারের খানিক বৃত্তান্ত। আনুর মা আয়েশার পিঠা তৈরির দৃশ্য আমাদের এই ভূগোলের শীতকালীন বিশেষ খাদ্যাভ্যাসের ঐতিহ্যটি উঠে আসে। গ্রামীণ এক সম্পন্ন পরিবারে বেড়ে উঠলেও ধর্মীয় কুহকবিভ্রমগ্রস্থ আনুর বাব কাজী মাজহারুল ইসলাম তাকে মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দেন। আনুর বোন আসমা কিছুদিন ধরে জ্বরে ভুগছে। আনুর বাবা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক কাজী সাহেব নিজেই চিকিৎসা করছেন। মেয়ের জ্বর না কমার অভিযোগ শুনে কাজী সাহেব এর জন্য আসমার বাইরে ঘোরাঘুরিকেই দায়ী করেন। মেয়েকে নিয়ে কথোপকথনের একপর্যায়ে আয়েশা ঘরের আধো অন্ধকার তাড়াতে জানালা খুলে দেয়। বাইরে বিপুলা সবুজ প্রকৃতি। প্রাণের স্ফুরণ ও বিকাশ যে প্রকৃতিতে তারই এক আহ্বান যেন বা এই ক্ষুদ্র অথচ তাৎপর্যময় দৃশ্য। মেয়ে আসমার সঙ্গীহীনতা ও ছেলে আনুকে মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দিয়ে তাকে নিঃসঙ্গ করে দেওয়ার অনুযোগ করে আয়েশা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরমুহূর্তে বাইরে থেকে সেই জানালার ওপর একটি ক্লোজ শট স্থির হয়ে থাকে। ঘরের ভেতরে থাকা কাজী সাহেব উঠে এসে আস্তে করে জানালার সামনে দাঁড়ান। ক্যামেরা খানিক টিলডআপ হয়ে স্থির হয়। কারাগারের মতো রডের বিন্যাসে নির্মিত ওই জানালায় বহুদিন ধরে চর্চিত সংস্কারের মতো মাকড়শার জাল ঝুলে আছে। জানালাটি বন্ধ করে দিয়ে কাজী সাহেব ধর্মান্ধতার গহ্বরেই যেন বা নিজেকে লুপ্ত করেন।

কাজী চরিত্রটি আপাত নিরীহ এই দৃশ্যের অবতারণায় এক লহমায় সমগ্রসহ অঙ্কিত হয়ে যায়। পরক্ষণেই মাদ্রাসার নিরেট দেয়ালের দৃশ্য, আনকাট ট্রলি ঠেলে আনুর চুল কর্তনের মুহূর্তে এসে ঠেকে। কিন্তু ধর্মীয় এই শিক্ষায়তনের কঠোরতা কঠিন দেয়ালগাত্র দর্শনে দর্শকের ভেতর প্রবিষ্ট হয়। আনুর চুলে কাঁচি চালাতে চালাতে ক্ষৌরকার ধর্মীয় ও শ্রেণীগত বিভাজনের পাঠ দান করেন।

মাদ্রাসার এই নিরঙ্গ জীবনে আনুর একমাত্র বন্ধু হয়ে ওঠে রোকন নামের অপর এক কিশোর। এই গন্ডীবদ্ধতা রোকনকে ক্রমে অসুস্থ করে তোলে। শেষ পর্যন্ত অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেলে মাদ্রাসার মালখানায় বন্দী করা হয় তাকে।

আনুকে মাদ্রাসায় পাঠানোর কার্যকারণ উদ্ঘাটিত হয় খানিক পরে। আমরা দেখতে পাই, কাজীর ছোট ভাই মিলনের সঙ্গে বাংলার ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাইচ দেখে ফেরার পর এই নির্দোষ বিনোদনকে 'হিন্দুয়ানী' আখ্যা দিয়ে আনুকে 'রক্ষার' নামে মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন কাজী সাহেব। মিলন প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।

উদ্ভট ভৌগোলিক বিভাজনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান নামের রাষ্ট্রযন্ত্রটির উদ্ভব। এই অংশ পূর্ব পাকিস্তান আর হাজার মাইল ব্যবধানে পশ্চিম পাকিস্তান। এই দুয়ে মিলে 'পাকিস্তান'। অখন্ড ভারত হিন্দু ও মুসলিম এই দুই 'জাতি'তে বিভক্ত হয়ে তিন খন্ডে দুটি রাষ্ট্রে ভাগ হয়ে যায়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা এই অঞ্চলকে দেশ হিসেবে নয়, নিজেদের উপনিবেশ হিসেবেই গ্রহণ করেছে। ফলে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই এ অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ জারি রাখে। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন তা ক্রমেই এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সামগ্রিক মুক্তি আন্দোলনের সূচনা ঘটায়। এ ভূখণ্ডের মানুষ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় ভাষা ও ঐতিহ্যভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে। কিন্তু তার মধ্যেও কতিপয় ধর্মান্ধ ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানকে বহাল রাখার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। কাজীকে আমরা দেখতে পাই সেই পাকিস্তানপন্থীদের সারিতে। পাকিস্তানিদের প্রতি তার বিশ্বাস এতটাই গভীরে প্রোথিত যে অন্তিম দৃশ্যে দেখা যায়, হানাদার বাহিনীর হামলায় ভস্মীভূত ঘরের ভেতরে ধর্মগ্রন্থের পুড়ে যাওয়া খণ্ডিত পৃষ্ঠা হাতে দাঁড়িয়ে থেকেও তাদের প্রতি অবিশ্বাস আনতে পারে না সে। তাকে খানিক বিস্মিত দেখায় শুধু। এ সময়েও যখন পাকিস্তান প্রেমীদের চাক্ষুস করি, তখন আমাদের চোখে তারেকের সৃষ্ট কাজীর অবয়ব ভেসে ওঠে। সেই দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই, আয়েশা ছেলেসন্তান আনুকে নিয়ে পালাতে থাকেন বেঁচে থাকার তাগিদে, নতুন জীবনের সন্ধানে। এখানেই চলচ্চিত্রটির আপাত সমাপ্তি ঘটে। আপাত এই অর্থে যে আমাদের ভেতর তখন নতুন মুক্তির গান শুরু হয়। এ ভূখণ্ডের মানুষের মুক্তিযুদ্ধের অকৃত্রিম দৃশ্যগুলো তারেকের মুক্তির গানে তাল ঠুকেছে। যেন বা মায়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়া আনুই এককালে মাদ্রাসাপড়–য়া তারেক মাসুদ। মুক্তির গান তবে কি মাটির ময়নার সিক্যুয়াল! ঠিক নিশ্চিত নই। কিন্তু ঐতিহ্যনিষ্ঠ তারেকের সাংস্কৃতিক আন্দোলন মুখীনতা সেদিকেই তো আলো ফেলে, যুদ্ধের বিভীষিকাময় কালে সীমান্ত ঘুরে ঘুরে সুরে-সংগীতে মুক্তিকামী মানুষের মনে উদ্দীপনা জোগানো দলের অভিযান, সে তো তারেকেরও গন্তব্য।

আন্তর্জাতিকভাবে বহুল প্রশংসিত মাটির ময়না বিশ্ব চলচ্চিত্রের সবচেয়ে সম্মানজনক আসর বলে পরিচিত কান চলচ্চিত্র উৎসবে আন্তর্জাতিক ক্রিটিক অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে। বাংলাদেশের কোনো চলচ্চিত্র নির্মাতার জন্য এখন পর্যন্ত এটিই সবচেয়ে বড় সম্মান।

পাঁচ.
কারও সঙ্গে আত্মার নৈকট্য অনুভবই আত্মীয় করে তোলে। রক্তসম্পর্করহিত এই অকাল প্রয়াত মানুষটির সঙ্গে রুচি বিশ্বাসে অন্তরঙ্গতা অনুভব করেছে অগণিত মানুষ। তিনি হয়ে উঠেছিলেন প্রিয় থেকে প্রিয়তর। তাঁর এই আকস্মিক অনাকাঙ্ক্ষিত অন্তর্ধানে সর্বব্যাপ্ত শোক তাই সহজাত।

কর্ম, ঐতিহ্যনিষ্ঠা আর দক্ষতা ইত্যাকার অসামান্য গুণে অনন্য এক শিল্পীতে পরিণত হয়েছিলেন তিনি। আমাদের সৎপ্রবৃত্তিজাত দৃশ্যমাধ্যম তাঁকে পাশ কাটিয়ে সম্মুখপানে ধাবিত হবে না কোনো দিন। জানি, জীবন একদিন ফুরাবে, তার তরী ভেসে হারাবে অনন্তের স্রোতে। তবু সময় ফুরোবার আগে যেজন রাখে মাথা প্রাজ্ঞ মৃত্যুর কোলে, তার জন্য জাগে শোক। যেজন চুকিয়ে দেয় জীবনের পাঠ, সেজন নির্ভার। আর আমরা এখনো নিঃশ্বাস নিচ্ছি যারা, ক্রমশ পুড়ে যেতে থাকি নীলাভ্র দহনে। তাতে লোনা জলের শুশ্রূষা নেই, কেবল ভেতরে চেপে বসে বেদনার হিমালয়।

‘তারেক মাসুদ’ নামে আমাদের হৃদয়ে চিরকালীন আসন পাতা হলো।

দূরন্ত পারাপার
আলোকচিত্র: মোহাম্মদ ইলিয়াস চৌধুরী

একটি ভালোবাসার কবিতা

ফারাবী

রিকশায় আজ তোমায় দেখলাম
খোলা চুলে, গলার নিুংশের সাদা সৌন্দর্যের সাথে,
আর তিন চাকার ঘূর্ণনের সাথে সাথে
তোমায় আমি হারালাম।
তোমার দু চোখ যেন নেশার কূপ
যেখানে আমি হারিয়ে যাব
দীর্ঘ সময়ের জন্য।
গতির ঘূর্ণনের মতো আমি ঘুরব
তোমার দু চোখের নেশার জগতে।
জলাঞ্জলি যাক চির-একাকি থাকার স্বপ্ন
যদি তুমি বলো চার অক্ষরের শব্দটি ভালোবাসি।
নীল আকাশের নিচে আমি তোমায় পেয়ে সুখী হতে চাই।

অতিমানবী

কালপুরুষ

ফালগুনী রাতে;
দেখেছি তারে-অন্ধকারের সাথে।
যখন যুগল পেঁচা সবুজ চোখ মেলে
আঁধারে বিস্ময় খোঁজে সৃষ্টির আড়ালে।
দেখি নীলাভ দুটি চোখ তার, স্বচ্ছ জলের ন্যায় শরীর
চুপে হাওয়া এসে বলে গেল, 'এ মানবী নয় এ পৃথিবীর।'
অতঃপর-
স্বচ্ছ তার জলের মতো শরীরের রহস্য জানতেই-
পৃথিবীতে এসেছিল প্রথম ভোরে ...

কত আগে তাকে ভালোবেসেছিলাম
আজ তার তা মনে নেই।
গোপনে গোপনে কত অনুভূতি
জন্মে ছিল তোমার জন্য! মনে নেই।
কবে খেলার ছলে আঁধারের বুক চিরে
এক টুকরো আলো বের করে এনেছিলাম!
কোন নারীর পবিত্র স্পর্শে
ঘুম গিয়েছিল ভেঙে
হেমন্ত নক্ষত্রের রাতে
অনেক পুরোনো সে রাত
সে রাতে পূর্ণিমা ছিল কি না-মনে নেই..
তবু সেই সব দিনরাত্রির ঘ্রাণ লেগে আছে বুকে
যেই সব দিন তার মুখ দেখা হতো...
ঝরে গেছে সময় ঘাস মাটির ওপর
সূর্যাস্তের শেষ রং মুছে দিয়ে শেষ পাখি ফিরে গেছে নীড়ে।
হয়তো সেও আমাকে ভালোবেসেছিল;
আজও বাসে!
তবু কেউ আমায় মনে রাখেনি
শেষ বিকেলের নরম রোদের মতো
তার দেহের ঘ্রাণও মুছে গেছে এ প্রাণ থেকে

ভালোবাসা

তুহিন সরকার

মুকুলে ঝরে যাওয়া সন্ধ্যাতারা
আকস্মিক ধূমকেতু হয়ে
রেখে যাওয়া তোমার অভিমান
হঠাৎ দেখা কল্পনাপ্রসূত ভালোবাসা
পূর্ব আকাশে রংধনুর রঙিন ছটা
তোমার নগ্ন পা ছুঁয়ে যাওয়া শিশিরকণা সবুজ ঘাসে।
নীল জ্যোৎস্নায় হারিয়ে যাওয়া.....

স্মৃতির জানালায় ১

মো. মুজিব উল্লাহ

জীবনপ্রবাহে ক্লান্তিহীন ছুটে চলা
অস্থির বিষাদের প্রতিটি ক্ষণ
অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে রোদ্দুর পথ পাড়ি দেওয়া
আর নাগরিক জীবনের দীর্ঘশ্বাস
ভুলে যেতে চাই দেখে দেখে অরণ্য প্রকৃতি।
হঠাৎ করে ছায়াতরু, ঝাউবন, একটি ফুলবাগান
স্মৃতির আঙিনায় শান্ত মনে গভীর সুখের
হারিয়ে যাওয়া শৈশবটাতে ঝড় তোলে।
স্বর্গ ছুঁয়ে নেমে আসা মেঘের অশ্রুমালা
দমকা হাওয়ায় লুকোচুরি খেলা, বৃষ্টিতে সাঁতরে বেড়ানো
আমি দেখছি মৃদু হাসছে স্মৃতির দেওয়ালে।
ভাঙাচোরা টিনের ঘরের ছোট্ট জানালা দিয়ে
উঁকি মারা সূর্যের কিরণ কল্পনায় ছুঁয়েছি।
ঝরনাধারার ন্যায় নৈসর্গিক প্রশান্তি নেমে আসে মনে
যেন বাবার প্রিয় ফুলবাগানে
ভালোবাসার পসরা সাজিয়ে প্রতীক্ষারত জীবন্ত পুষ্প
পুতুলের সাথে গড়া বন্ধুত্বের দুর্ভেদ্য প্রাচীর
অশ্বত্থগাছের ছায়ায় ভূত দেখে শিউরে ওঠা
আর মুক্ত স্বাধীনতা, নিজস্ব ভালোবাসা, শৈশবের বন্ধুত্ব...

পৃথিবীর ভালোবাসা

কে এম ওমর ফারুক

আজও পৃথিবীর ভালোবাসা হিংসা আর করুণা নিয়ে বাঁচে
আজও মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বিপদে কাঁদে,
হাজার হাজার মানুষেরা আজও মাটির মতো
সহনশীল হতে জানে না;
ঘাড় বাঁকানো তরল বুদ্ধি খাটিয়ে
মায়াময় সংসার ভাঙে নিশ্চিন্তে
অথচ গর্বিত বাঙালিরা
স্বদেশের প্রেমে আজও বাঁচে;
আজও তারা শান্তি চায় বলে
শান্তির কথা বলে,
চিরচেনা শুভ দিনের অপেক্ষায় থেকে থেকে
লাল-সবুজের পতাকা বুকে ধারণ করে, আর
লাল-সবুজের তুলি দিয়ে রূপসী বাংলার ছবি আঁকে।

আজ শ্রাবণের শেষ বর্ষা হয়ে গেছে,
সমস্ত প্রকৃতি ধুয়ে ধুয়ে পবিত্র হয়েছে;
পবিত্র হতে পারেনি আমার বাংলার মাটির মানুষেরা।
অস্বস্তির ভেতর দিয়ে যেন
আজও প্রতিহিংসাই গর্জে ওঠে
আর পৃথিবীর ভালোবাসা হিংসা আর করুণা নিয়ে বাঁচে।

বৃষ্টি মানে

প্রাজ্ঞজন

বৃষ্টি মানে ঝোড়ো বাতাস, øিগ্ধ আলোর ছটা
বৃষ্টি মানে বৈশাখী মেঘ, বজ্রপাতের ঘটা

বৃষ্টি মানে মেঘের আঘাত, আলোক স্বল্প রোদ
বৃষ্টি মানে সবুজ বায়ু, খরার প্রতিশোধ

বৃষ্টি মানে দিনের আলোয়, গাছের পাতার মেলা
বৃষ্টি মানে প্রশান্ত-মন, রৌদ্র-মেঘের খেলা

বৃষ্টি মানে উদাসভাব, দূর পানে চাওয়া
বৃষ্টি মানে মৃদু ছন্দ, ঝিরি ঝিরি হাওয়া

বৃষ্টি মানে ভেজা জমিন, সিক্ত গাছের ছায়া
বৃষ্টি মানে সঙ্গী ছাড়া, সৃষ্টিসুখের মায়া...।

দাম বাড়ে

মাহফুজ মেহেদী

দাম বাড়ে খাতা আর
দাম বাড়ে কলমের
দাম বাড়ে ট্যাবলেট
ক্যাপসুল, মলমের।

দাম বাড়ে তেল-নুন
দাম বাড়ে মুরগির
দাম বাড়ে আটা-সুজি
চাল-ডাল, গুড়-ঘির।

দাম বাড়ে জামা-জুতা
দাম বাড়ে প্যান্টের,
দাম বাড়ে স্নো-ক্রিম
পাউডার, সেন্টের।

দাম বাড়ে টিভি-টেপ
ভিসিআর, বেতারের,
দাম বাড়ে হারমনি
একতারা, সেতারের।

দাম বাড়ে এটা আর
সেটা সাথে ওটারও,
হাঁড়ি-কুরি, ঘটি-বাটি
দাম বাড়ে লোটারও।

দাম বাড়ে অকারণে
ঈদ আসে যেই,
এ দেশের মানুষের
কোনো বোধ নেই!

সনেট: জন্ম ও ক্রমবিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে প্রধান বিবেচ্য বিষয় ও সহজবোধ্যতা

weKvj

সনেট; কাব্যশিল্পে কবিত্বের টেকসই অস্ত্র। জন্ম ইতালি। ইতালীয় Sonneto থেকে Sonnet| hvi A_ 'ছোট সংগীত'।

ত্রয়োদশ শতকের শুরুর দিকে ইতালীয় কবি ফ্রান্সেসকো পেট্রেকা এ কবিতার আনুষ্ঠানিক পরিচিতি ঘটান সাহিত্য জগতে। mvbv`ó MVb-আঙ্গিক, ভাবের ক্রমবিস্তারে নাটকীয়তা এ কবিতাকে করেছে অনন্য।

সনেটে চৌদ্দ চরণের আবশ্যকীয়তা অবশ্যম্ভাবী। বাকি অন্য বৈশিষ্ট্যগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে রূপান্iZ হয়েছে। তবে রূপান্তরিত হয়ে যা-ই হোক, কঠোর অনুশাসনের মধ্যে থাকা এ কবিতার জন্মগত বৈশিষ্ট্য।

ওই কঠোর অনুশাসনগুলো কী তা আলোকপাত করার জন্য এ লেখা। আশা করি পরবর্তীতে বর্ণিত সনেটের জন্ম ও ক্রমবিবর্তন-সম্পর্কিত আলোচনা আমরা মনোযোগ সহকারে পড়ব, বিবেচনা করব এবং নিজেরাই অনুধাবন করতে পারব যে সনেটকে আমরা স্বভাবত যত কঠিন মনে করি, তত কঠিন নয়। সনেট রচনায় সিদ্ধান্ত হবে আমাদের নিজস্ব; তার ওপর ভিত্তি করে রচিত হবে আরও--আরও বেশি সফল সনেট, নতুন প্রাণ পাবে মৃতপ্রায় সনেটচর্চা। নতুন নতুন রূপে নাচবে-গাইবে আমাদের সামনে!--এই হলো প্রত্যাশা।

প্রথমত, ফ্রান্সেসকো পেট্রেকা। ইতালীয় কবি। প্রথম সনেট রচয়িতা হিসেবে স্বীকৃত তিনি। তাঁর সনেট পেট্রেকীয় সনেট হিসেবে পরিচিত। ইতালীয় ভাষার গঠনশৈলীতে প্রতি চরণে ১১ ছন্দমাত্রা ব্যবহার করে ফুটিয়ে তোলেন ১৪ লাইনের সনেট।

প্রিয় মানুষ 'লোরা'কে প্রস্ফুটিত করতে গিয়ে তিনি ১৪ লাইনকে ভাগ করেন দুই ভাগে; নাম Octav Ges Sestet| c_g AvU jvBb nj Octav, আর শেষ ছয় লাইন হল Sestet| Octav-Gi cথম চার লাইনে করেন কোনো সমস্যার সুচনা, প্রকাশ পায় আকাঙ্ক্ষা, উত্থাপিত হয় বাস্তবচিত্র, বিধৃত হয় ব্যক্তিগত অনিশ্চয়তা বা বিরোধের কারণ। দ্বিতীয় চার লাইন প্রথম চার লাইনের ভাবকে ক্রমে উৎকর্ষ দিয়ে শেষ হয়। এই শেষ Octav|

অন্ত্যমিল থাকে এভাবে–

KLLK KLLK.
এরপর শুরু হয় নবম লাইন। এখান থেকে শুরু হয় ভাবের মোড় নেওয়া। ভাব এগোতে থাকে পরিণতির দিকে। এটি Sestet; যা সমাধান বা উপসংহার নিয়ে শেষ হয়। আর এখানে অন্যমিল থাকে এভাবে...
MNO MNO.
সুতরাং সম্পূর্ণ কবিতার অন্যমিলের অবয়ব দাঁড়ায় এভাবে...
KLLK KLLK MNOMNO.
এখানে স্পষ্টত পরিলক্ষিত হয় যে তিনি দুই লাইনের কোনো শে-াক ব্যবহার করেননি তাঁর সনেটে।

পরে ইংরেজ কবি থমাস ওয়েট পেট্রেকীয় সনেটকে অনূদিত করেন। নিয়ে আসেন ইংরেজিতে। তখনকার সময়কে এলিজাবেথীয় সময় বলা হয়ে থাকে। ব্যবহার করেন ওধসনরপ চবহঃধসবঃবৎ; যেখানে ব্যবহৃত হয় দুই মাত্রার দুটি শব্দগুচ্ছ, শব্দগুচ্ছ উচ্চারিত হয় পাঁচবার। দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারিত হয় প্রথম শব্দের চেয়ে বেশি গুরুত্ব সহকারে। সুতরাং হয়ে গেল দশমাত্রা। যেমন--
iv‡L-Xv‡K, iv‡L-Xv‡K, iv‡L-Xv‡K, iv‡L-Xv‡K, iv‡L-Xv‡K|
ইংরেজি সনেটের সূচনা হলো দশমাত্রার ছন্দে। পরে অপর এক ইংরেজ কবি ফিলিপ সিডনি প্রথম সনেটে ব্যবহার করেন ওধসনরপ ঐবীধসবঃবৎ; যেখানে থাকে দুই মাত্রার দুটি শব্দগুচ্ছ, উচ্চারিত হয় ছয়বার। ফলে হয়ে গেল ১২ মাত্রা। উচ্চারণ সেই ওধসনরপ চবহঃধসবঃবৎ এর মতোই, কেবল শব্দগুচ্ছ হলো ছয়টা।

দ্বিতীয়ত. থমাস ওয়েট ষোড়শ শতাব্দীতে সনেটকে ইংরেজি সাহিত্যে নিয়ে আসেন এটা সত্যি; কিন্তু ইংরেজ কবিদের মধ্যে সনেট রচনায় সবচেয়ে সফলতা দেখান অপর এক ইংরেজ কবি উইলিয়াম শেকসপিয়ার। যার সনেট শেকসপিয়ারীয় সনেট নামে পরিচিত।
শেকসপিয়ারীয় সনেট ভিন্ন আঙ্গিক গঠন নিয়ে সূচিত হয়। ছন্দমাত্রা এবং লাইন যথাক্রমে সেই ১০ এবং ১৪। ভাবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সেই পেট্রেকীয় পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং মোড়ও সেই নবম লাইন থেকেই শুরু হয়। ভিন্নতা ১৪ লাইনের বিভক্তিতে ও অন্যমিলে, সংযুক্ত হয় কবিতার সর্বশেষে একটি দুই লাইনের শে-াক, যাকে ঘিরে আবর্তন করে কবিতার কাহিনি এবং বহন করে আশ্চর্যজনক উপসংহার।
তিনটি চার লাইনের স্বক এবং একটি দুই লাইনের শে-াক.. এই হলো শেকসপিয়ারীয় সনেটের ১৪ লাইন। অন্যমিলে..
KLKL MNMN OPOP QQ
hw` I শেকসপিয়ারীয় সনেট ইংরেজি সনেটের পরিশুদ্ধরূপ, তবুও মিল্টনীয় সনেটে আরও বেশি পরিশুদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। ইংরেজ কবি জন মিল্টন পেট্রেকীয় সনেটকে বৈশিষ্ট্যমূলক অবয়ব থেকে মুক্ত করেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে মিল্টনীয় সনেট সাময়িক কোনো ঘটনার ওপর আলোকপাত করে রচিত হতো।

তৃতীয়ত, এবার আলোকপাত করা যাক এডমন্ড স্পেনসারের সনেটে। তিনিও একজন ইংরেজ কবি। যাঁর সনেট স্পেনসেরিয়ান সনেট নামে পরিচিত।
কবি এডমন্ড স্পেনসার তাঁর সনেটে ১৪ লাইনকে ঠিকই ভাগ করেছেন শেকসপিয়ারীয় আদলে। কিন্তু ব্যতিক্রম এই যে তিনি চার লাইনের প্রতিটি স্বকের সঙ্গে একটি চেইনের মতো সংযোগ বিধান ঘটান, যা অন্ত্যমিলের এই গঠন অবকাঠামো দেখে বোঝা যায়...
KLKL LMLM MNMN OO|
চার লাইনের স্বকের এরূপ বুনন সন্দেহাতীতভাবে শেকসপিয়ারীয় সনেটকে অনুসরণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে পেট্রেকীয় সনেটকেও মনে করিয়ে দেয়। তা সহজে বোঝার জন্য অন্ত্যমিল সাজাব এভাবে..
KL KLLM LMMN MNOO|
স্পেনসেরিয়ান সনেটে ভাবের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতির ভঙ্গি সেই চিরাচরিত নিয়মেই হয়। মাত্রার প্রাধান্য 10-এ। তবে শেকসপিয়ারীয় সনেটের শেষ দুই লাইনের শে-াকের অত্যধিক ব্যবহার কমিয়েছিলেন তিনি। শেষ দুই লাইনে তিনি কেবল বিধৃত ভাবের সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেন।
মোটকথা, স্পেনসেরিয়ান সনেট পেট্রাকীয় ও শেকসপিয়ারীয় সনেটের মিশ্রিত রূপ বলা যায়।

চতুর্থত, এবার আসব আমাদের বাংলা সনেটে। বাংলা সনেটের জয়যাত্রা সূচিত হয় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাত ধরে। অস্থিতিশীল ছন্দমাত্রায় কবি ১৪ কে বেছে নিয়ে ফুটিয়ে তোলেন কবিতার চরণ। অন্ত্যমিলে অনুসরণ করেন পেট্রিকীয় পদ্ধতি। প্রকাশভঙ্গি অনেকটা মিল্টনের সঙ্গে মিলে যায়। ভাবের ক্রমবিকাশ ও পরিণতিও পেট্রাকীয়, উপজীব্য ছিল মূলত দেশপ্রেম ও প্রকৃতি।

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যুর পর সনেট চর্চা দীর্ঘদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এ শূন্যতায় অবগাহন করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নতুন প্রাণ ফিরে পায় বাংলা সনেট। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সনেটে ভাবের উপজীব্য ছিল বিশেষত মানবীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সংগীত, ভাষার গঠনশৈলী, প্রকৃতি, সংগঠন ইত্যাদি। তবে কবিগুরুর মাঝে শেকসপিয়ারীয় ভাব পরিলক্ষিত হয় বেশি। এমনকি তিনি মাত্র ১৩ লাইন ব্যবহার করেও দীর্ঘদিন সনেট চর্চা চালিয়ে যান; তবে তা সনেটের গঠনশৈলীর বিচারে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। Gici অনেক সনেট হয়তো রচিত হয়েছে, কিন্তু আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়ার মতো তেমন কিছু ঘটেনি।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান এ গদ্যের যুগে আমরা প্রধান বিবেচ্য বিষয় বিবেচনা করব নিবরূপভাবেঃ

প্রথমে বলব চরণ নিয়ে। সেই ত্রয়োদশ শতক থেকে আজ অব্দি সফল সনেটের আলোচনায় ১৪ চরণই সর্বজন স্বীকৃত। মূলত সনেট বলতেই ১৪ চরণ অবশ্যম্ভাবী।

দ্বিতীয়ত, ছন্দমাত্রার গঠনশৈলী। মাইকেল মধুসূদন দত্ত হয়তো ১৪ চরণের সঙ্গে মিল রেখে ১৪ মাত্রার ছন্দে সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। ১৪ পদের সঙ্গে মিল রেখে ১৪ মাত্রা;..ছোট অবয়বে এUv GKUv PgrKvi সংযোজন। সনেটের জন্মলগ্ন থেকে বাংলা সনেট পর্যন্ মাত্রার তুলনা করতে গেলে বলতেই হয়... ইতালীয় সনেটে ১১ মাত্রা, ইংরেজি সনেটে ১০ মাত্রা আর বাংলা সনেটে ১৪ মাত্রা। যেহেতু ঐতিহ্যের প্রশ্ন, আমরা ১৪ মাত্রা অবশ্যই অনুসরণ করব। আর সনেটের মাত্রার বিভক্তির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট bxwZgvjv wkíiPbv কঠিনীকরণ ছাড়া কিছুই নয়, যদি না চরণে ছন্দমাত্রা আধুনিককালে চলমান কাব্যরচনার ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

তৃতীয়ত, ভাবের উপজীব্যের ব্যাপারে তেমন কোনো সীমাবদ্ধতা নেই, যদি না সূচনা, উৎকর্ষ ও পরিণতি থাকে।

চতুর্থত, অন্যমিল। সনেটে অন্যমিলের অনুশাসন যে সুনির্দিষ্ট নয়, তা ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ক্রমবিকাশকালে ভাব যেহেতু চার লাইনের স্বকের শুরুতে ভিন্ন মোড় নেয়, সেহেতু অন্যমিলের অনুশাসন চার লাইনে সীমাবদ্ধ রেখে পেট্রাকীয়, শেকসপিয়ারীয় বা স্পেনসেরিয়ান যে কোনটা ব্যবহার করতে পারি।

পরিশেষে বলতে পারি, সনেট নিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত ভয় আমরা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি; যা বাংলা সাহিত্যে সনেট রচনাকে আরও বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে নতুন নতুন শিল্পীর ছোঁয়ায়। সবার জন্য শুভ কামনা।

সংগৃহীত

শূন্য!

মৃন

বেশ কিছুক্ষণ থেকে একটা কাক কর্কশ গলায় চিৎকার করছে। তীব্র শীত পড়েছে আজ, এই শীতের মধ্যে কাকটার এত চিৎকার করতে ইচ্ছা হলো কেন কে জানে! বেলা কত হয়েছে, আমজাদ মিয়ার পক্ষে বোঝা কঠিন। তার বহু পুরোনো হাতঘড়িটা কিছুদিন আগে নষ্ট হয়ে গেছে। মেরামত করার টাকা নেই। শীতকালে তার আয় এমনিতেই কম, আর এবার তো একটু বেশিই শীত পড়েছে। আমজাদ মিয়ার কাজ হলো একটি ওজন পরিমাপক যন্ত্র নিয়ে শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে বসে থাকা। কেউ নিজের ওজন মাপতে চাইলে মেশিনের ওপর উঠে দাঁড়ায়, আমজাদ মিয়া মেশিনের কাঁটা দেখে বলে দেয় ওজন কত হয়েছে; আর জনপ্রতি এক টাকা করে নেয়। একলা মানুষ, এভাবেই তার দিব্যি চলে যায়। তা ছাড়া এর চেয়ে শক্ত কোনো কাজ করার সামর্থ্য তার নেই। একে তো সত্তর বছর বয়স হয়েছে, তার ওপর একটা পা নেই।

আজ আর বেরোতে ইচ্ছা করছে না আমজাদ মিয়ার। বুকের ব্যথাটাও বেড়েছে অনেক। রিলিফ থেকে পাওয়া কম্বলটা শক্ত করে গায়ে জড়িয়ে নেয় সে। কিন্তু কাকটা বড় জ্বালাতন করছে! হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়, আজ মাসের নয় তারিখ। ঘরভাড়া শোধ করতে হবে। গত মাসে ঘরের মালিক জামসেদকে পুরো টাকা দিতে পারেনি। এ জন্য অনেক গালি শুনতে হয়েছে তাকে। এ মাসে পুরো টাকা না দিতে পারলে ঘর থেকে বের করে দেবে তাকে। বিএনপি বস্তির এই ঘরটা অনেক কম টাকায় ভাড়া পেয়েছে সে। জামসেদের এ রকম আরও চার-পাঁচটা ঘর আছে। মাদকের ব্যবসা করে জামসেদ। এই বস্তিতে তার বেশ প্রভাব; অনেকেই তাকে ভয় পায়। জামসেদ অন্যদের কাছ থেকে এক হাজার টাকা করে ঘরভাড়া নিলেও আমজাদ মিয়াকে মাত্র ছয় শ টাকায় একটা ঘর ভাড়া দিয়েছে। এ জন্য অবশ্য জামসেদ মাঝেমধ্যে আমজাদ মিয়ার ঘরে মেয়েছেলে নিয়ে আসে, তখন আমজাদ মিয়াকে বাইরে থাকতে হয়।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে আমজাদ মিয়া। টাকা জোগাড় করতে হবে। ঘরভাড়া দেওয়ার জন্য জমিয়ে রাখা টাকাগুলো বের করে গুনে দেখে, মোট ৪৯১ টাকা হয়েছে। আরও শ খানেক টাকা দরকার। ঘরে খাবারও প্রায় শেষ হয়ে গেছে; অল্প একটু চিড়া ছিল, সেটুকু খেয়েই বেরিয়ে পড়ে সে। বাইরে এসে দেখে কাকটি এখন আর ডাকছে না, চুপ করে ধ্যানমগ্নের মতো বসে আছে। আমজাদ মিয়া মনে মনে কাকটাকে ধন্যবাদ দেয়, ওটা বিরক্ত না করলে হয়তো এত তাড়াতাড়ি ওঠা হতো না তার।

কাছের পার্কটায় এসে অনেকটা হতাশই হতে হয় বৃদ্ধ মানুষটিকে। তীব্র শীতের মধ্যে পার্কে মানুষের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। অগত্যা বাধ্য হয়েই তাকে বেশ খানিকটা পথ হেঁটে কারওয়ান বাজার আসতে হয়। কারওয়ান বাজারের আন্ডারপাসটার মুখে একটা জায়গা করে বসে পড়ে আমজাদ মিয়া। এতটা পথ ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটার কারণে মনে হচ্ছে বুকের ব্যথাটা বেড়েছে আরও; তা ছাড়া একটামাত্র পাতলা চাদরে শীতও মানছে না।

ঢাকা শহরের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ। সমগ্র শহর ঢাকা পড়েছে ঘন কুয়াশার চাদরে। স্বাভাবিকভাবেই রাস্তাঘাটে মানুষের উপস্থিতি অনেক কম। গাড়িগুলো হেডলাইট জ্বালিয়ে তুলনামূলক ধীরগতিতে চলছে। এই দৃশ্য দেখে কে বলবে এই নগরই পৃথিবীর অন্যতম প্রধান জনবহুল শহর! এই দুর্যোগের দিনে নিতান্ত প্রয়োজনে যারা বাইরে বেরিয়েছে, তাদেরও দ্রুত কাজ শেষ করে ঘরে ফেরার তাড়া। হাসান সাহেবও তেমনই একজন, জরুরি একটা কাজে বাধ্য হয়েই ব্যাংকে আসতে হয়েছে তাঁকে। হাসান সাহেব আন্ডারপাসের ভেতর থেকে উঠে আসার সময় আমজাদ মিয়া অনেক আশা নিয়ে তাঁর দিকে তাকায়। বেচারার অবস্থা আজ খুবই করুণ। দুপুর গড়িয়ে গেলেও তার এখন পর্যন্ত মাত্র সতেরো টাকা আয় হয়েছে। হাসান সাহেব তার দিকে একবারও না তাকিয়ে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যান। আমজাদ মিয়া ব্যথিত চোখে মানুষটির চলে যাওয়া দেখে। তাকে ছাড়িয়ে পাঁচ গজ যাওয়ামাত্রই সারা শরীর চাদরে ঢাকা এক যুবক পাশ কাটাতে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দেয় হাসান সাহবের গায়ে। হাসান সাহেবের বাম হাতে থাকা একটি চিপসের কৌটা ঝনঝন শব্দে গড়িয়ে পড়ে কংক্রিটের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে একই রকম আরও দুটি যুবক এসে দুই পাশ থেকে চেপে ধরে হাসান সাহেবকে। এবার প্রথম যুবকটি তার চাদরের ভেতর থেকে ধাতব একটা বস্তু বের করে হাসান সাহেবের মাথায় আঘাত করে। হাসান সাহেব এক হাতে তার মাথাটা চেপে ধরেন, অন্য হাতে ধরে থাকেন তার কালো ব্যাগটি, যেটি ছিনিয়ে নিতে টানাটানি করছে একটি যুবক। হাসান সাহেব শক্ত করে ব্যাগটি টেনে ধরার চেষ্টা করেন। পরিস্থিতি জটিল হয়ে যাচ্ছে দেখে অন্য একটি যুবক তার পকেট থেকে মলম বের করে হাসান সাহেবের চোখে লাগিয়ে দেয়। তীব্র যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠেন তিনি। এবার প্রথম যুবকটি হ্যাঁচকা টানে তার হাত থেকে ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত তিনজন আন্ডারপাসটার মধ্যে ঢুকে যায়। হাসান সাহেব প্রথমে দুই হাতে তার চোখ দুটো চেপে ধরে বসে পড়েন, তারপর জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান।

সবকিছু এত দ্রুত আমজাদ মিয়ার চোখের সামনে ঘটে যায়, তার শুধু নির্বাকের মতো চেয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করার থাকে না। সামনে একটা মানুষ জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে, দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার, কিন্তু সে কী করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তার মতো পঙ্গু একজন মানুষের পক্ষে তো একা কিছু করা সম্ভব নয়। এমন সময় দেখা যায়, হাসান সাহেবের ড্রাইভার গাড়ি থেকে বেরিয়ে দ্রুত ছুটে আসছে, সেই সঙ্গে আরও তিন-চারজন লোক এগিয়ে আসে। তারা সবাই ধরাধরি করে হাসান সাহেবকে গাড়িতে তুলে দেয়। ড্রাইভার দ্রুত হাসপাতালের দিকে গাড়ি ছোটায়। আমজাদ মিয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, সেই সঙ্গে তার মনটাও খারাপ হয়ে যায়। অল্পবয়সী যুবকগুলো সব বিপথে চলে যাচ্ছে! এরা এই হতভাগা দেশটাকে কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে! অথচ এই দেশের জন্যই একদিন সে তার সবকিছু হারিয়েছে।

টিনের লম্বা কৌটাটা এখনো পড়ে আছে। আমজাদ মিয়া ওটা তুলে এনে তার ব্যাগে রাখে, পরে লোকটির কেউ এলে দিয়ে দেওয়া যাবে এই ভেবে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থেকেও আজ মাত্র চুয়াল্লিশ টাকা হয়েছে তার। মাঝে মাঝে অবশ্য ভালো দিনও আসে। গত বছর একবার ২৫৩ টাকা হয়েছিল এক দিনে। এমনিতে গড়ে ১০০ টাকার মতো হয় প্রতিদিন। অথচ আজ! আজ কপালটা একটু বেশিই খারাপ তার। আর বসে থেকে লাভ নেই। এবার ঘরের দিকে রওনা হওয়া যায়। তা ছাড়া শরীরটাও আর সায় দিচ্ছে না তার। ঠান্ডা বাতাসের মধ্য দিয়ে হেঁটে ঘরে ফেরার পর আমজাদ মিয়ার মনে হয়, তার সারা শরীর যেন ঠান্ডায় জমে বরফ হয়ে গেছে। একটা বনরুটি আর পানি খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে সে।

বাইরে শোঁ শোঁ করে ঠান্ডা বাতাস বইছে। বুকের ব্যথাটা এখন আর নেই আমজাদ মিয়ার। কিন্তু কী আশ্চর্য! সেই কখন থেকে বিছানায় পড়ে থেকেও কিছুতেই ঘুম আসছে না তার। হয়তো ক্ষুধার কারণে হতে পারে এটা। আজ সারা দিন ভাত খেতে পারেনি সে। বিছানা থেকে উঠে বাতি জ্বালায় বৃদ্ধ মানুষটি। খুঁজে দেখে ঘরে কোনো খাবার অবশিষ্ট আছে কি না; না, নেই কিছু। হতাশ হয়ে দুই গ্লাস পানি খেয়ে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ে সে। আর তখনই মনে পড়ে চিপসের কৌটাটার কথা। পরে লোকটির কেউ আর না আসায় ওটা তার কাছেই রয়ে গেছে। হাসান সাহেবের কথা মনে পড়ায় খারাপ লাগে তার, বেচারা! কিছুটা দ্বিধা নিয়েই ব্যাগ থেকে ওটা বের করে সে। বেশ ভারী। শেষ পর্যন্ত ক্ষুধার কাছে পরাজিত হয়ে কৌটাটার মুখ খুলেই ফেলে সে। কিন্তু ভেতরের বস্তু দেখার পর সারা শরীর অবশ হয়ে আসে আমজাদ মিয়ার! কৌটার মধ্যে টাকার বান্ডিল! হাসান সাহেব কী একটা ভেবে চিপসের এই খালি টিনের মধ্যে টাকা রেখেছিলেন, আর ব্যাগে ছিল প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ অল্প কিছু টাকা!

বিছানায় শুয়ে আছে আমজাদ মিয়া। অনেক রাত হয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু তার আর শেষ পর্যন্ত ঘুম আসেনি। একটা আজব চিন্তা তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে অনেকক্ষণ থেকে। সে তো এই টাকাগুলো নিজের কাছে রেখে দিতে পারে! একটু আগে টাকাগুলো একবার গুনে দেখেছে সে, এক লাখ টাকার তিনটি বান্ডিলে মোট তিন লাখ টাকা! সবগুলো এক হাজার টাকার লাল নোট! নানান চিন্তা খেলা করে বৃদ্ধ আমজাদ মিয়ার মাথায়, কী হবে সততা দেখিয়ে? সারাটা জীবনই তো সে সৎভাবে থাকার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বিনিময়ে কী পেয়েছে সে? সমগ্র জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলো যেন একে একে জীবন্ত হয়ে ওঠে তার চোখের সামনে...মোটামুটি ভীতু ধরনের মানুষই ছিল সে। মুক্তিযুদ্ধের সময় অন্য অনেকের মতো সেও তার স্ত্রী সালমা আর পাঁচ বছরের কন্যা টুনিকে নিয়ে ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। কিন্তু যুদ্ধের মাঝপথে অনাহারে আর রোগে ভুগে তার একমাত্র আদরের কন্যা টুনি মারা যায়। তার পক্ষে ওই শোক সহ্য করা সম্ভব ছিল না। স্ত্রীকে এক আত্মীয়ের দায়িত্বে রেখে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং নেয় সে। তারপর কী ভয়াবহ যুদ্ধ! দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় নিজেকে তখন অন্যভাবে আবিষ্কার করে আমজাদ মিয়া।

যুদ্ধের সময়কার অনুভূতিগুলো আজও সমান উজ্জ্বল তার মানসপটে। তখন যদি কেউ তাকে বলত, 'তোমার বুকের কলিজাটা আমাকে দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা এনে দেব', তবে সে তার বুক চিরে একটানে তার কলিজাটা ছিঁড়ে দিত! যুদ্ধের শেষ দিকে একটা গেরিলা অপারেশনে তার বাম পায়ে গুলি লাগে। সহযোদ্ধারা বহু কষ্টে সীমান্ত পেরিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও অনেক দেরি হয়ে যায় ততক্ষণে, ডাক্তার তার বাম পা হাঁটুর নিচ থেকে কেটে বাদ দিয়ে দেয়।

বাংলাদেশের আকাশে যখন বিজয়ের লাল-সবুজ পতাকা ওড়ে, আমজাদ মিয়া তখন ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি হাসপাতালের বিছানায়। তবু তার মনে সেদিন এতটুকুও কষ্ট ছিল না। তার মাথায় সেদিন কেবল একটা ভাবনায় খেলা করে গেছে, কখন সে তার প্রিয় মাতৃভূমির বুকে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নেবে! স্বাধীনতার কদিন পরই তার স্ত্রী অন্য একজনের সঙ্গে দেশে চলে আসে নতুন করে বাঁচার স্বপ্নে। মন থেকেই এটা মেনে নেয় আমজাদ মিয়া। কেনই বা একটা অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে সারাটা জীবন একটা পঙ্গু মানুষের সঙ্গে থাকবে! স্বাধীনতার ছয় মাস পর বহু কষ্টে দেশে ফিরে আসে আমজাদ মিয়া। কিন্তু দেখে, তার সব জমি অন্যরা দখল করে নিয়েছে। কোনো প্রতিবাদ করে না আমজাদ মিয়া। জমি নেই তো কী হয়েছে! এই দেশটা তো তার, প্রিয় মাতৃভূমি তো শত্রুমুক্ত হয়েছে! সে একা মানুষ, জমি দিয়ে করবেই বা কী? তার তখন মনে হয় টুনির অকালমৃত্যু, তার একটা পা হারানো, তার স্ত্রীর চলে যাওয়া বা তার জমিগুলো দখলদারদের দখলে যাওয়া এই সবকিছুই শূন্য! একটি দেশের স্বাধীনতার জন্য এসব তুচ্ছ ঘটনার সবটাই শূন্য! ঢাকায় এসে একটা ছোট কারখানায় হিসাবরক্ষণের কাজ নেয় সে। তার পর ৩৫টি বছর কেটেছে, কিন্তু কখনোই নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা দাবি করেনি সে। কয়েক বছর আগে মালিকের মৃত্যুর পর তার ছেলেরা আমজাদ মিয়াকে চাকরিচ্যুত করে। এর পর থেকেই তার এই অবস্থা।

শেষ রাতের দিকে আমজাদ মিয়া সিদ্ধান্ত নেয় সে এই টাকাটা ফেরত দেবে না। তার মনটা ভালো হয়ে যায় এবং শরীর জুড়িয়ে প্রশান্তির ঘুম আসে।

আজ বেশ বেলা করে জামসেদের ডাকে ঘুম ভাঙে আমজাদ মিয়ার। জামসেদ টাকা নিতে এসেছে, আমজাদ মিয়া অনুনয় করে বলে, আগামীকাল টাকা দেবে। দু-একটি কটু কথা শুনিয়ে চলে যায় জামসেদ। তুলনামূলক কম শীত পড়েছে আজ। বুকের ব্যথাটা বাড়ায় আজ আর বাইরে যায় না বৃদ্ধ আমজাদ মিয়া; নিজের টাকাটা থেকেই খাবার কিনে এনে কিছুটা খেয়ে আবার শুয়ে থাকে সে। বুকের ভেতরে তীব্র ব্যথা নিয়ে সারাটা দুপুর কষ্ট করে সে। বিকেলের দিকে আমজাদ মিয়া সিদ্ধান্ত নেয় ডাক্তারের কাছে যাওয়ার। টিনের কৌটাটা আর নিজের ঘরভাড়া দেওয়ার জন্য জমানো টাকাটাও কী মনে করে সঙ্গে নেয় সে। শ্যামলীতে একটা ক্লিনিকে এসে চমকে ওঠে আমজাদ মিয়া! অভ্যর্থনা কক্ষে একজন মহিলার সঙ্গে তার মেয়ে টুনি বসে আছে! ওই তো টুনি! অবিকল টুনি, তার মেয়ে! নিজের মেয়েকে সে কেন চিনতে ভুল করবে! সিরিয়াল চলে আসায় মেয়েটিকে নিয়ে ভদ্রমহিলা ডাক্তারের রুমে ঢুকে পড়েন।

একটা ঘোরের মধ্যে ডাক্তার না দেখিয়ে ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে আসে আমজাদ মিয়া। হঠাৎ করেই মনে হচ্ছে, তার বয়স অনেক বেড়ে গেছে। হাঁটতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তার, তবু হাঁটতে হাঁটতে শহরের শেষ প্রান্তে চলে আসে বৃদ্ধ মানুষটি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আমজাদ মিয়ার সমস্ত বোধ আচ্ছন্ন হয়ে আসে। সবকিছু আবারও শূন্য মনে হয় তার কাছে স্বাধীনতার পর যে রকম শূন্য মনে হয়েছিল সবকিছু। এই শহর, এই পাথুরে রাস্তা, আকাশছোঁয়া দালান সবকিছুই তার কাছে শূন্য মনে হয়! পৃথিবীর সবকিছুই শূন্য, কেবল তার কন্যা টুনিই একমাত্র মূর্ত! একটা সিএনজি অটোরিকশা ভাড়া করে দ্রুত কারওয়ান বাজার যেতে বলে আমজাদ মিয়া। কারওয়ান বাজার পৌঁছে নিজের টাকা থেকেই ভাড়া শোধ করে দেয় সে। তার শরীরটা আরও খারাপ লাগছে, আন্ডারপাসের মুখে বসে পড়ে সে।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই রাত সাড়ে নয়টার দিকে কারওয়ান বাজার চলে আসেন হাসান সাহেব। শরীরটা এখনো ভীষণ দুর্বল তাঁর, চোখেও ঝাপসা দেখছেন, কিন্তু কিছুই কেয়ার করেন না তিনি। আন্ডারপাসটার মুখে বসে থাকা বৃদ্ধ লোকটির দিকে এগিয়ে যান তিনি। তাকে দেখেই ক্রাচে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায় বৃদ্ধ মানুষটি। তিনি কিছু বলার আগেই আমজাদ মিয়া তার ব্যাগ থেকে টিনের কৌটাটি বের করে এগিয়ে দেয়। বাকরুদ্ধ হয়ে একমুহূর্ত থমকে দাঁড়ান হাসান সাহেব। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই ছোঁ মেরে কৌটাটি নিয়ে খুলে দেখেন তিনি, নাহ! সব ঠিকই আছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করে আমজাদ মিয়া, তার বুকের ব্যথাটা বেড়েছে আরও। পেছন থেকে তাকে ডেকে থামান হাসান সাহেব। হাসান সাহেবের মুখে কোনো ভাষাই আসছে না। তিনি টাকার একটা বান্ডিল বৃদ্ধ মানুষটির দিকে বাড়িয়ে দেন। বৃদ্ধ লোকটি ওটা না ধরে বলে, ‘বাবা, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধের সময় আমি একটি পায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার একমাত্র আদরের কন্যাকে হারিয়েছি। কিন্তু মাতৃভূমির স্বাধীনতার কাছে সবই শূন্য, আমার পাঁচ বছরের কন্যা টুনিও শূন্য!’ এটুকু বলেই হাসান সাহেবকে আর কোনো কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করে আমজাদ মিয়া। হাসান সাহেব কেবল তাকিয়ে দেখেন সড়কবাতির ক্ষীণ আলোয় এক-পায়ের একজন বৃদ্ধ মানুষ কুয়াশার চাদরে হারিয়ে যাচ্ছে। তার ক্রাচ দুটো থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ আসছে...।

দূরন্তপনা
আলোকচিত্র: সালেহ উদ্দিন উজ্জল

ঈদের পেছনের ঈদ

Avãjvn-Avj-gvgb

‘ফরিদ, তুই পটকাটা হাতে ধরে রাখ, চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমি আগুন দিলেই তুই দূরে ছুড়ে মারবি। কি, পারবি তো?’ হুম, ওই, ওই দেখ চাঁদ উঠেছে, চাদ উঠেছে। দ্রিম দ্রিম, দ্রুম দ্রুম দ্রুম। বন্যায় যেন পাল তুলে শুরু হলো ঈদের যাত্রা। ‘এই, রাসেল। চল, তাড়াতাড়ি চাল-ডিম কিনতে হবে। মুকুলকে আসতে বল। আর যার যার যে যে তরকারি, মসলা, কাঠ–এগুলো আনার কথা, দ্রুত নিয়ে বালুর মাঠে চলে আয়। আমি ক্যাসেট প্লেয়ার চালানোর ব্যবস্থা করছি।’ সবাই দৌড়–‘দেখা হ্যায় পাহেলি বার, সাজন কে আখো মে পেয়ার’ ফুল ভলিউমে বেজে চলেছে, চারদিকে চিৎকার, চেঁচামেচি, হইহুল্লোড়। হঠাৎ চিৎকারটা আরও বেড়ে গেল কবিরের হাতে একটা লাল টকটকে খান্দানি মোরগ দেখে। কবির খুব সাহসী আর ডানপিটে। সে তার নিজের বাড়ি থেকে মোরগটি চুরি করে এনেছে বন্ধুদের খাওয়াবে বলে। আর সেই আনন্দেই সবাই ‘কবির’ ‘কবির’ বলে উল্লাস করছে। গভীর রাত পর্যন্ bvPMvb, wPrKvi, cUKvevজি আর আনন্দের পর শুরু হয় খাওয়া-`vIqv| ঘাসের ওপর গোল হয়ে বসে কলাপাতার ওপর গরম ভাত আর মুরগির ঝোলের স্বাদ এখনো রাসেলের জিভে লেগে আছে। করপোরেট অফিসে চাকরির বদৌলতে সে কেএফসি, বিএফসি থেকে শুরু করে শেরাটন, র‍্যাডিসনেও একাধিকবার খেয়েছে, কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে বসে কলাপাতায় খাবারের মতো অমৃত সে কোথাও পায়নি। সেই উল্লাস, আনন্দ আর দস্যিপনা সে আর ফিরে পাবে না। ডাটা সেন্টারের কন্ট্রোল রুমে বসে অন্যমনস্ক হয়ে এসবই ভাবছিল রাসেল। হঠাৎ কলিগ মাসুদের ডাকে ভাবনায় ছেদ পড়ে।

‘রাসেল ভাই, নামাজ পড়বেন না?’
‘হুম, গোসল করে এসেছি, আর ১০ মিনিwU ci hve|ô
‘চলেন, জাতীয় ঈদগাহে যায়।’
‘না, মাসুদ, ডাটা সেন্টার এইভাবে ফেলে গেল সমস্যা হতে পারে।’
‘আরে পরিমল তো আছেই। এক ঘণ্টার জন্য কিছু হবে না।’
‘ঠিক আছে। চল, যায়। পরিমল, তুমি একটু সামলিও, ভাই।’

‘রাসেল ভাই, এইভাবে জীবন চলে বলেন? আমি জীবনেও আব্বু-আম্মুকে ছেড়ে ঈদ করি নাই। ঈদের নামাজ পরে প্রথম কোলাকুলি করি আমার আব্বুর সঙ্গে, আর প্রথম পা ছুঁয়ে সালাম করি আমার আম্মাকে। আমি চাকরি ছেড়ে দিব, ভাই।’ বলতে বলতে গলা ধরে এল মাসুদের। সবার জীবন কি আর সব সময় একভাবে চলে, পাগল ছেলে! আর, আসলে, আগে এমন ছিল না। গত বছর ঈদের সময় ডাটা সেন্টারের মূল ডেটাবেজ ক্লাস্টার ভেঙে পুরো সিস্টেম ডাউন হয়ে গিয়েছিল।

ফলে পুরো দেশের মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক ডাউন। আর ঈদের সময় নেটওয়ার্ক ডাউন হলে খুব পাবলিক সেন্টিমেন্টে লাগে। সেবার তো সবাই ঈদের গ্রামের বাড়ি গেছে, ভেন্ডরের লোকজনও ছিল না। পরে সিইও স্যার ইন্টারন্যাশনাল সাপোর্টে লগইন করেছে নিজে এসে। পরে আমাদের সিটিও স্যার নারায়ণগঞ্জ থেকে এসে অনলাইন সাপোর্ট টিমকে আমাদের নেটওয়ার্কে ঢোকার অনুমতি দিলে পরে দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা চেষ্টার পর নেটওয়ার্ক আপ করতে পেরেছিল। কিন্তু এর মধ্যেই পাবলিক ক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের বেশ কিছু অফিসে ভাঙচুর করেছিল। সেই জন্য তারপর সিদ্ধান্ত নিছে, সব সময় ডাটা সেন্টারে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার থাকবে। আর এটা কিন্তু শুধু আমাদের কোম্পানির সমস্যা না। আমার একজন বন্ধু ডাচ-বাংলা ব্যাংকে চাকরি করে, ওদের এটিএম ২৪ ঘণ্টা সাপোর্টের জন্য এবার ঈদে ওর দায়িত্ব পড়েছে। আর আমার হিন্দু বন্ধুরা তো সবাই ঈদে Awdস করে। স্যার সেদিন বলছিলেন, আমাদের এখানেও আরও কিছু হিন্দু ছেলেপেলে নিবে। তখন আর আমাদের সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ।'

'হুম, বুঝছি। আসলে, আমার ভুলটা হয়ছে পাবলিক রিলেটেড কোম্পানিতে ঢুকে। আমার কাজিন সরকারি চাকরি করে। ও ১০ দিন ছুটি পেয়েছে ঈদে। আপনি বুজেন, রাসেj fvB, 10 w`b!ঁ

'হা হা! পাগল ছেলে। সরকারি অনেক সেক্টরেও ঈদে ছুটি পায় না। যেমন র‍্যাব। ওরা দেখবা, ঈদের নামাজ পড়ে সবাই, আর ওরা দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। তুমি চিন্তা করতে পার! ওরাও তো মানুষ। সুতরাং তুমি অনন্ত ওদের চেয়ে ভালো আছো, তাই না? হা হা হা। আসলে, দেখো মাসুদ, তুমি যখন একটা মঞ্চনাটক দেখো, তখন কিন্তু তোমার আনন্দ লাগে। কিন্তু ওই নাটক প্রডিউস থেকে শুরু করে প্রেজেন্টেশন পর্যন্ত wKQ gvbl কতটা কষ্ট করে, তুমি চিন্তা করতে পার! সেই রকমভাবেই ঈদের আনন্দ সবার মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য কিছু লোক অক্লান্ত পরিশ্রম করে। তাদের কষ্টে ভর করেই আমরা ঈদের আনন্দ উপভোগ করি। এতে দোষের কিছু নেই। তবে আমরা যেন ভুলে না যায় তাদের কষ্টের কথা।...এই, এই রিকশা, দাঁড়াও দাঁড়াও। হুম চলো।...মাসুদ, আজকে কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে প্রথম কোলাকুলি করব, তারপর তুমি আমায় সালাম করবে।'

'রাসেল ভাই, তাইলে কিন্তু ঈদি দিতে হবে। হা nv nv|ঁ
'আমার শ্যালিকার সঙ্গে কথা বলায়ে দিলে হবে! হা হা হা ।'
'তাইলে তো আমারে পাই কে! হা হা হা...।

প্রধান মালীর গল্প

(আন্তন চেখভের 'দ্য হেড গার্ডেনার'স স্টোরি' অবলম্বনে)

ইরতিয়ায দাস্তগীর

নুরু ব্যাপারির বাগানে ফুলের নিলাম উপলক্ষে আমরা কয়েকজন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে আমি ছিলাম, জমির মালিক আমার এক প্রতিবেশী ছিলেন, ছিলেন এক তরুণ কাঠব্যবসায়ী। কাজের লোকেরা আমাদের কেনা অসাধারণ জিনিসগুলো বাঁধাছাঁদা করে ট্রলিতে উঠাতে থাকলে আমরা বাগানে ঢোকার মুখেই বসে বসে একটি বিষয়ে আলাপ করছিলাম। এপ্রিলের সকালে বাগানে বসে রোদ পোহাতে পোহাতে পাখির কলকাকলিতে কান পেতে খোলা বাতাসে ফুলের সৌন্দর্য উপভোগের ব্যাপারটা সত্যিই ছিল সুখদায়ক।

প্রধান মালী মইনুদ্দিন শ্রদ্ধা জাগানোর মতো পুরোপুরি কামানো মুখের একজন বয়স্ক মানুষ। কোট ছাড়া একটি পশমের ওয়েস্টকোট পরে গাছগাছড়ার বাঁধা-ছাঁদা প্যাকেট করা নিজেই তদারক করছিলেন। কিন্তু একই সময় নতুন কিছু শোনার প্রত্যাশায় সে আমাদের আলাপচারিতার দিকেও সজাগ কান রেখেছিল। সহৃদয় বিচক্ষণ লোকটি সবার সম্মানের পাত্র ছিল। একজন জার্মান হিসেবে কয়েকটি কারণে সবার কাছে নিন্দিত ছিলেন, যদিও পিতৃকুলের দিক থেকে সে ছিল সুইডিশ, মায়ের দিক থেকে রুশ, এবং অর্থোডক্স চার্চেও যেত। জার্মান, রুশ আর সুইডিশ ভাষা জানা ছিল তার। সেই ভাষাসমূহে ইবসেন সম্পর্কে সে বেশ কিছু পড়াশোনা করেছিল। কিন্তু সেগুলোর কোনোটিই উদাহরণ হিসেবে তাকে নতুন কিছু বই ধার দেওয়া কিংবা তার সঙ্গে আলাপ করার মতো আনন্দ দিতে পারেনি।

তার একটাই দুর্বলতা ছিল, নিজেকে প্রধান মালী বলে পরিচয় দিত, যদিও তার অধস্তন কোনো মালী ছিল না, তার মুখের অভিব্যক্তি ছিল অসাধারণভাবে সম্মানিত ও উদ্ধত; অসংগতিটা ধরতে না পারলেও শ্রদ্ধা- মনোযোগ সহকারে শুনতে পছন্দ করতেন।

"'আপনাকে বলে দিচ্ছি, ওই তরুণ সহকর্মীটি খুবই বদমাশ প্রকৃতির।' কৃষ্ণকায় জিপসিদের মতো দেখতে একটি লোকের প্রতি যে একটি পানির পিপা ঠেলছিল আঙুল উঁচিয়ে বললেন আমার প্রতিবেশী। 'গেল সপ্তাহে শহরে একটি চুরি করতে গিয়ে ধরা খেয়েও বেঁচে গেছে। তালপাতার সেপাইয়ের মতো দেখতে এবং মাথা খারাপ বলে ছেড়ে দিয়েছে। দেশটায় আজকাল এই সব পাজি আর দুই নম্বর লোকগুলাকে অস্বাভাবিকতার ধোয়া তুলে বাঁচিয়ে দেওয়াটাও এক ধরনের অপরাধপ্রবণতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, যা ভালো নেতৃত্ব নয়। তারা জনগণকে নীতিভ্রষ্টতা শেখাচ্ছে, ভোঁতা করে দিচ্ছে বিচারবোধ, অভ্যস্ত করে তুলছে শাস্তিমুক্ত কলঙ্ক দেখায়। এবং তুমি জানো, আমাদের সময়ে কেউ একজন নির্ভয়ে বলতে পারত শেকসপিয়ারের সেই কথাটা-আমাদের দূষিত বয়সের পাপের জন্য পুণ্যার্থে ক্ষমা চাইতে হবে।'

"'এটা খুব সত্য,' ব্যাপারি বলল, বাকি মুক্তি-পাওয়া লোকগুলা হত্যা ও অগ্নিসংযোগ থেকে অনেক বেশি ভয়াবহ. কৃষকদের ডেকে জিজ্ঞাসা করতে পারো।'

মইনুদ্দিন আমাদের দিকে ফিরে বলল, 'ভদ্র মহোদয়গণ, আমার মন যতটা সায় দেয়, আদালতের রায়ে নির্দোষ প্রমাণিত লোকগুলোর সঙ্গে সাক্ষাতে আনন্দই পাই। নৈতিকতা আর ন্যায়বিচারের জন্য আমার ভয় নাই, যখন তারা বলেন "অপরাধী নয়"। অন্যদিকে আমি এ দেশটাতেই সন্তুষ্টি বোধ করি। আমার বিবেক যখন বলে জুরি অপরাধীকে খালাস করে কোনো ভুল করেছে, তবু আমি বিজয়ী বোধ করি। তারা আপনার নিজের জন্যই। মানুষের ওপর যদি বিচারক আর জুরিদের বিশ্বাসবোধ থাকে, তাহলে লক্ষণ-প্রমাণের উপাদান, আদালতে কথাবার্তা চালিয়ে যা হয়, মানুষের সেই বিশ্বাস কি সাধারণ কোনো বিবেচনাবোধের চেয়ে উন্নততর নয়? সেই বিশ্বস্ততা কেবল তাদের গুটি কয়েকেরই প্রাপ্য, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী।'

"'একটি চমৎকার ভাবনা,' আমি বললাম।

"'কিন্তু এটা নতুন কিছু নয়। মনে পড়ে, অনেক কাল আগে এ ব্যাপারে একটি কিংবদন্তি শুনেছিলাম। খুবই মজার কিংবদন্তি!' বলে, হাসল মালী। 'আমি এটা আমার দাদি-আম্মা, অর্থাৎ আমার বাবার মায়ের কাছে শুনেছিলাম, যিনি চমৎকার একজন মহিলা ছিলেন। তিনি সুইডিশ ভাষায় এটা বলেছিলেন, যেটা মার্জিত বা সুন্দর ছিল না, ক্লাসিক্যাল রুশ ভাষা।'

কিন্তু আমরা তা সাদামাটা রুশ ভাষায় বলতে তাকে অনুরোধ করলাম। সে খুশি মনে তার পাইপ ধরাল এবং খানিকটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কাজে ব্যস্ত লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে আবার শুরু করলো, 'একটি ছোট্ট নির্জন শহরে টমসন বা উইলসন নামের এক সজ্জন বৃদ্ধ থাকতেন। কিন্তু সেটা কোনো ব্যাপার নয়, তার নামটা তত জরুরি নয়। তার পেশাটা ছিল সম্মানজনক-ডাক্তার। তিনি খানিকটা রূঢ় প্রকৃতির আর অসামাজিক ছিলেন। তার পেশার প্রয়োজনেই কেবল কথা বলতেন। তিনি কারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন না। জানাশোনা কারও উদ্দেশে নীরবে মাথা ঝোঁকানোর বাইরে যেতেন না। থাকতেন বিনম্র সাধকের মতোই। আসলে, তিনি ছিলেন একজন শিক্ষিত মানুষ। সেকালের শিক্ষিত লোকেরা অন্যদের পছন্দ করতেন না। দিনরাত ব্যয় করতেন পড়াশোনা, গভীর চিন্তা-ভাবনা আর রোগনিরাময়ের পেছনে। বাকি সব ছিল তুচ্ছ। একটা বাড়তি শব্দও অপচয়ের সময় ছিল না। শহরবাসী তা বুঝত এবং তাদের দেখা-সাক্ষাৎ আর অসার বকবকানিতে তাকে বিরক্ত করতে চাইত না। তারা খুশি ছিল, ঈশ্বর তাদের জন্য অবশেষে এমন একজন মানুষকে পাঠিয়েছেন, যিনি রোগ নিরাময় করতে পারেন। তাদের অহংকার ছিল যে, এমন একজন অসাধারণ মানুষ তাদের শহরেই আছেন। তার সম্পর্কে তারা বলত, তিনি সবই জানেন।

"‘কিন্তু তারা অবশ্য যা বলত, তা-ই যথেষ্ট ছিল না। তিনি সবাইকেই ভালোবাসতেন। তার বুকের ভেতর ফেরেশতার মতোই একটা বিস্ময়কর হৃদয় স্পন্দিত হতো। যদিও শহরের মানুষ ছিল অচেনা, তার আপন কেউ না, তবু তিনি তাদের ভালোবাসতেন সন্তানের মতোই, তাদের থেকে নিজেকে বিযুক্ত করতেন না কখনোই। ক্ষয়, কাশ তাকে শেষ করে ফেলছিল, তবু কারও অসুখের খবর পেলে ভুলে যেতেন নিজের অসুখের কথা। তাদের থেকে নিজেকে আলাদা ভাবতে পারতেন না। হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি পাহাড়ে উঠে যেতেন, তা যতটা উঁচুই হোক না কেন। শীত-গ্রীষ্ম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা কোনো কিছুই পাত্তা দিতেন না। কারও কাছে টাকা-পয়সা প্রত্যাশা করতেন না। অদ্ভুত রকমভাবে বলতেন, তার কোনো রোগী যখন মারা যাবে, সম্পর্কের সূত্র ধরে তিনিও কাঁদতে কাঁদতে তার কফিনের সঙ্গে যাবেন।"

"‘এবং শীঘ্রই তিনি তার বাসিন্দাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠলেন। তারা বিস্মিত হয়ে ভাবল যে, এই মানুষটিকে ছাড়া আগে তারা কীভাবে ছিল! তাদের কৃতজ্ঞতা ছিল সীমাহীন। বয়স্ক থেকে আরম্ভ করে শিশু, ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ সবাই তাকে একই রকম মান্যগণ্য করত। বুঝত তার কদর। ছোট্ট শহরটির আশপাশের যত লোক ছিল, তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে তার সঙ্গে বিসদৃশ কিছু করবে। এমনটা নিয়ে তারা স্বপ্নেও কখনো ভাবত না। তিনি যখন বাড়ির বাইরে যেতেন, দরজা-জানালা কখনোই লাগাতেন না। তার পুরোপুরি বিশ্বাস ছিল যে, তার কিছু চুরি হবে না, এমন ভুল তার সঙ্গে কেউ করবে না। তিনি প্রায়ই তার চিকিৎসকের দায়িত্ব পালনের বাইরেও রাস্তায়, বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ানোর সময় কিছু ক্ষুধার্ত আর উদ্বাস্তুকে দেখতেন। কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে প্রকৃত নিরাপত্তা বোধ করতেন।"
"‘এক রাতে তিনি একটি রোগী দেখে যখন ফিরছিলেন, তখন ডাকাতের কবলে পড়েছিলেন। কিন্তু ডাকাতেরা তাকে চিনতে পেরে সম্মান দেখাতে নিজেদের টুপি খুলে ফেলে তাদের সঙ্গে কিছু খেতে আমন্ত্রণ জানাল। তিনি ক্ষুধার্ত নন জানালে তারা তাকে একটি গরম চাদর দিয়েছিল। সেই সদাশয় মানুষটির প্রতি অদৃষ্টের কৃপায় খানিকটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে শহরের দিকে বেশ কিছুটা পথ এগিয়েও দিয়েছিল। ওহ, ভালো কথা, এটা নিশ্চিত দাদি-আম্মা বলেছেন যে, এমনকি গরু-ঘোড়া, কুকুরও তাকে চিনত; সেই সঙ্গে দেখা হলে আনন্দও প্রকাশ করত। "

"‘এবং এই মানুষ তার ধার্মিকতার মাধ্যমে যাবতীয় মন্দ থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতেন, এমনকি ডাকাত ও প্রমত্ত পুরুষেরাও যার জন্য শুধু ভালো ছাড়া মন্দ কামনা করত না। এক সুন্দর সকালে তাকে মৃত পাওয়া গেল; রক্তে মাখামাখি, মাথা ফাটানো অবস্থায়-ম্লান মুখে একটি গভীর বিস্ময়ের অভিব্যক্তি আঁকা ছিল। হ্যাঁ, ভয়াবহ না হলেও বিস্ময়ের ব্যাপারটা হলো, আবেগটা তার চেহারায় স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল খুন হওয়ার আগে, যখন খুনিকে দেখতে পেয়েছিলেন। আপনারা ভাবতে পারবেন, সেই শোক শহরের আর জেলার আশপাশের মানুষজনকে কতটা বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। লোকজন এতটাই হতাশ হয়ে গিয়েছিল যে, নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। তারা ভেবে পাচ্ছিল না, এমন একজন মানুষকে কে খুন করতে পারে!

যে বিচারক ডাক্তারের দেহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন, তিনি বললেন, “এখানে আমরা খুনের সব লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু পৃথিবীতে এমন একটি মানুষ নাই যে আমাদের ডাক্তারকে খুন করার সামর্থ্য রাখে। সাক্ষ্য-প্রমাণ সহযোগে একটি সহজ সুযোগ থাকলেও অবস্থা দেখে বলা যায় এটা খুনের মতো কোনো ঘটনা নয়। আমরা অবশ্যই ধরে নিতে পারি যে, তিনি অন্ধকারে ভয়ংকর গিরিখাদে পড়ে গিয়ে মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছিলেন।”
‘পুরো শহর এই মতের সঙ্গে একমত ছিল। ডাক্তারকে কবর দেওয়া হলে, কথিত একটি ভয়ানক মৃত্যুর বেশি কিছুই রইল না। কোনো মানুষের দুর্মতি থেকে একজন ডাক্তারকে খুন করাটা অবিশ্বাস্য। দুর্মতিরও একটা সীমা আছে, তাই না?”

‘আপনারা কি বিশ্বাস করবেন, হঠাৎ তাদের নেতৃত্বে খুনিকে ধরার একটি সুযোগ এল। এক ভবঘুরে, যে তার পঙ্কিল জীবনের জন্য কুখ্যাত আর বহুবার দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল, তাকে দেখা গেল একটি নস্যির কৌটা বিক্রি করতে চাইছে মদ খাওয়ার জন্য, যেটা ছিল ডাক্তারের। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন সে ঘাবড়ে গেল, আর যে উত্তরটা দিল তা ছিল পরিষ্কার মিথ্যা। তল্লাশি করে তার বিছানায় একটি শার্ট পাওয়া গেল যেটার হাতায় রক্তের ছোপ ছিল এবং ডাক্তারের অপারেশনের কাজে ব্যবহৃত সোনার ছুরি গুলো। এর বেশি প্রমাণ আর কী চাই? তারা অপরাধীকে জেলে ঢুকাল। লোকজন গরম হয়ে উঠল এবং তখনই বলে উঠল, “এটা অবিশ্বাস্য! এমনটা হতেই পারে না! খেয়াল রেখো ভুল যেন না হয়, আপনারা জানেন এমনটা হয়েছে, যে সাক্ষ্য-প্রমাণ একটি মিথ্যা গল্প বলছে!”

‘বিচারের সময় একরোখা খুনি তার নিজের বিরুদ্ধে উত্থাপিত যাবতীয় দোষ অস্বীকার করল। সবকিছুই ছিল তার বিরুদ্ধে। যুক্তি-প্রমাণে পৃথিবীটা কালো বলে বিশ্বাস করানোর মতোই সহজ ছিল তাকে দোষী সাব্যস্ত করা; কিন্তু মনে হচ্ছিল বিচারকেরা যেন মাথা খারাপ হয়ে গেছেন। প্রতিটা প্রমাণ দশবার করে যাচাই করলেন, সাক্ষীদের দেখলেন অবিশ্বাসের চোখ দিয়ে। রাঙা চোখ মেলে পানিতে চুমুক দিলেন... বিচারকাজ সকালের দিকে শুরু হয়ে বিকেলেই শেষ হয়ে গেল।

‘বিচারপতি খুনিকে উদ্দেশ করে বললেন, “অভিযুক্ত! আদালত ডাক্তার অমুককে খুন করার অপরাধে তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। এবং তোমাকে দণ্ডিত করা হলো...”

‘বিচারপতি বলতে চাইলেন, ‘সে সব মৃত্যুদণ্ড’। কিন্তু যে কাগজে কথাগুলো লেখা ছিল তা তিনি আছড়ে ফেলে দিয়ে মুখের ঘাম মুছে নিয়ে চিৎকার করে উঠলেন: “না! আমি যদি ভুল বিচার করে থাকি তাহলে ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দিবেন। কিন্তু আমি কসম খেয়ে বলতে পারি যে, লোকটি নির্দোষ। এমন চিন্তাকে আমি প্রশ্রয় দিতে পারি না যে, এখানে উপস্থিত কেউ আমাদের বন্ধু ডাক্তারকে খুন করার সাহস রাখে! একটি মানুষ হাঁটুপানিতে ডুব দিতে পারে না।”"

“‘এমনটা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়! অন্য বিচারকেরাও একমত প্রকাশ করলেন।”
“‘না।” ভিড় থেকে গুঞ্জরিত হলো, তাকে ছেড়ে দাও!”
‘খুনি মুক্ত হয়ে যেখানে খুশি চলে যেতে পারে এবং আদালতের রায় ন্যায্য নয়, তা কোনো প্রাণীই বলতে পারবে না। সেই সঙ্গে আমার দাদি-আম্মা বলতেন, সেই মানবিক বিশ্বাস বোধের জন্য ঈশ্বর শহরবাসীর যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি খুশি হন, মানুষ যখন বিশ্বাস করে যে, তারা তার আনন্দের প্রতিচ্ছবি। এবং কষ্ট পেলে মানুষের মর্যাদা ভুলে যায়, সেই বিচারে মানুষ কুকুরেরও অধম হয়ে পড়ে। প্রকৃত কথাগুলো শহরবাসীর জন্য বেদনাদায়ক হলেও অন্যদিকে মানুষের বিশ্বাসে ভাবনার উপকারী প্রভাব। আপনারা জানেন যে বিশ্বাসের মৃত্যু নেই। এমন মহৎ অনুভূতি আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে, এবং তা সব সময়ই আমাদের আনুপ্রাণিত করবে প্রতিটি মানুষকে ভালোবাসা আর সম্মান দিতে। সব মানুষ! এবং তাই গুরুত্বপূর্ণ।’

মইনুদ্দিন কথা শেষ করল। আমার প্রতিবেশী খানিকটা আপত্তি জানালেও প্রধান মালী ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল যে, আপত্তিটা সে পছন্দ করছে না। তারপর একটি মর্যাদাপূর্ণ ভাব নিয়ে ট্রলির দিকে এগিয়ে গিয়ে বাঁধাছাঁদার কাজ তদারক করতে লাগল।

আংটি: একটি ভালোবাসার গল্প

মোহাম্মদ ইলিয়াস চৌধুরী

মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ করেই মাহমুদ ঢাকায় একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে চাকরি পেয়ে গেল। অনেক চিন্তা-ভাবনা শেষে পরিবারের আপনজন ও প্রিয় শহর চট্টগ্রাম ছেড়ে সে ঢাকায় চাকরিতে জয়েন করল। কিছুদিনের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে পরিচয় হওয়া বয়সে বড় মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনটি পারিবারিকভাবেও বেশ পোক্ত হয়ে উঠল। কথায় কথায় একদিন মাসুদ ভাই বলল, বিয়ে করছ না কেন? বয়স তো আর কম হয়নি?

বিয়ে...? মনের মতো এখনো কাউকে পাওয়া হয়নি তাই বিয়েও করা হচ্ছে না।

কেমন পাত্রী চাও বলো?

আমার পছন্দের পাত্রীর বর্ণনা শুনতে চান, শোনেন... আমার পাত্রীতে হতে হবে মধুবালা, সূচিত্রা অথবা ঐশ্বরিয়ার চেহারায় যে মাধুর্যতা বা কমনীয়তা, তেমন চেহারার অধিকারিণী, ফিগার জানতে চান? ফিগারটা শিল্পা শেঠি অথবা সুস্মিতার মতো হলেও চলবে। হা. হা. হা.। কী, টাশকি খেলেন?

আঙুল দেখিয়ে-আর এই যে দেখছেন, আমার আঙুলের এই আংটিটি আমি তার জন্য এক যুগ ধরে আগলে রেখেছি। যখনই তাকে খুঁজে পাব, সঙ্গে সঙ্গে আঙুলে পরিয়ে আমার করে নিব। আবারও হাসি হা. হা. হা.। পাবেন কি আমার জন্য এমন পাত্রী?

ছোট ভাই, এটা তো তুমি বিয়ে না করার কথা বললে। কারণ, এমন মেয়ে বাস্তবে কখনোই পাওয়া যাবে না। তবে কম্পিউটারে ফটোশপ দিয়ে বানিয়ে নিতে পারো। বুঝেছি, অনবরত হিন্দি সিনেমা দেখতে দেখতে সুন্দরী সব নায়িকার মুখশ্রীর ভূত এখন তোমার মাথায় চেপে বসে আছে। ছোট ভাই, এসব চিন্তা মাথা থেকে বাদ দিয়ে বাস্তবে ফিরে আসো, নইলে কপালে দুঃখ আছে।

প্রায় এক সপ্তাহ পর হঠাৎ মাসুদ ভাইয়ের ফোন, খুব উল্লসিত মনে হচ্ছে তাকে। টেলিফোনের ও প্রান্ত থেকে হাসতে হাসতে বলল, 'ছোট ভাই, তোমার স্বপ্নের রাজকন্যাকে মনে হয় আমি পেয়ে গেলাম।'
কোন রাজকন্যার কথা বলছ?

কেন, ওই যে, যার ছবি তোমার হৃদয়ে আঁকা আছে, তার। শোনো, গতরাতে একটি পার্টিতে গিয়েছিলাম। ওই পার্টিতে আমার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের মেয়েকে দেখলাম, ঠিক তুমি যেমনটি চাও। ওদের সঙ্গে কথা বলেছি, ওরাও মেয়ের জন্য ভালো একটি পাত্রের সন্ধানে আছে। তোমার একটি সিভি দিয়ো।

পার্টিতে তোলা একটি ছবি মাসুদ ভাই মাহমুদকে দেখালেন। মেয়েটির নাম 'অপ্সরা' এবং অতি আগ্রহে অপ্সরার ভার্সিটি কোচিং ক্লাসের ঠিকানা জোগাড় করে দিলেন। একদিন সকালবেলা গ্রিন রোডে কোচিং ক্লাসের সামনে মাহমুদ অপ্সরাকে দেখার জন্য সময়মতো উপস্থিত হলো। অপ্সরাকে প্রথম দেখায় মাহমুদ মুগ্ধ হয়ে গেল। অসাধারণ! মায়াবী এক চেহারা। এত দিন মনে মনে ওকেই তো খুঁজছে মাহমুদ। না, আর দেরি নয়, পরদিন অপ্সরাদের বাসায় বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো হলো। অপ্সরার বাবা আবিদ সাহেব পাত্র পছন্দ করেছেন ঠিকই, তবে একটি শর্তে তিনি তাঁর একমাত্র মেয়েকে এই ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবেন। যদি ছেলে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে। মাহমুদ এমন শর্ত শুনে বোকা বনে গেল। এ কেমন শর্ত? বিয়ে করার জন্য নিজ জন্মস্থান, বাবা-মা-পরিবার সব ছাড়তে হবে? এমন অযৌক্তিক শর্ত মাহমুদ কিছুতেই মেনে নিতে পারল না। পুনরায় মাসুদ ভাই অপ্সরার বাবাকে বোঝালেন। তিনি কিছুতেই এই শর্ত ছাড়া মেয়ে বিয়ে দিতে রাজি নন। অগত্যা মাসুদ ভাই হাল ছেড়ে দিলেন এবং মাহমুদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন। কিন্তু মাহমুদ এক পলকের জন্য দেখা অপ্সরাকে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। মাহমুদের কেন জানি মনে হতে লাগল, অপ্সরা শুধু মাহমুদের জন্যই এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে। সে এখন অপ্সরাকে ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছে না। তার সমস্ত চিন্তা-চেতনায় এখন শুধু অপ্সরার উপস্থিতি।

মাহমুদ অনেক চিন্তা ও প্ল্যান করে মাসুদ ভাইয়ের স্ত্রী শীলা ভাবিকে পটালেন, যেন ভাবি অপ্সরার সঙ্গে মাহমুদকে পরিচয় করিয়ে দেন। অবশ্য এই প্ল্যানের কথা মাসুদ ভাইকেও জানানো হলো না। প্ল্যান অনুসারে গ্রিন রোডের কোচিং সেন্টারে প্রবেশের আগেই ভাবি অপ্সরাকে মাহমুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কথা বলার ফাঁকে হঠাৎ দমকা হাওয়া ও সঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়া শুরু হলো। বৃষ্টির ঝাপটা সবার গায়ে এসে লাগছে আর এভাবে এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাও সম্ভব নয়। পাশেই একটি ফাস্টফুডের দোকান ছিল, মাহমুদ ভাবিকেসহ অপ্সরা ও তার বান্ধবী লিসাকে ওখানে বসার আমন্ত্রণ জানাল। অপ্সরা প্রথমে কিছুটা আপত্তি করলেও বান্ধবী লিসার সম্মতি পেয়ে রেস্টুরেন্টে বসতে রাজি হলো। কিছু খাবারের অর্ডার দিয়ে টেবিলের একপাশে ভাবি আর মাহমুদ অন্য পাশে অপ্সরা ও লিসা বসল। টেবিলে মুখোমুখি বসেছে মাহমুদ আর অপ্সরা। মাহমুদ প্রথমে নিজের ও পরিবার সম্পর্কে ছোট্ট একটি ধারণা দিল অপ্সরা ও লিসাকে। তারপর কোনো ভূমিকা না করেই অপ্সরাকে তার ভালো লাগার বিষয়টি জানাল, সঙ্গে ভিজিটিং কার্ড দিয়ে বলল, আশা করি আপনি আগামী দু-এক দিনের মধ্যে ফোনে আমাকে আপনার মতামত জানাবেন। অবশ্য এর আগেই অপ্সরা বাসায় মায়ের কাছে মাহমুদের ছবিসহ সিভি দেখেছে এবং দেখে কিছুটা পছন্দও করেছিল। তবে যেহেতু বিয়ের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ বাবার ইচ্ছের ওপরই নির্ভর করছে, সেখানে পাত্রের ছবি দেখে অপ্সরার সম্মতি দেওয়া বা না দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

মাহমুদের ছবি দেখে আগেই অপ্সরা বিয়েতে সম্মতি দিয়েছিল। শুধু বাবার দেওয়া শর্ত পূরণ না হওয়ায় বিষয়টি ওখানেই চাপা পড়ে যায়। বিদায় বেলায় মাহমুদ আর অপ্সরার চার চোখের মিলন হয়, সে মিলনে মাহমুদ অপ্সরার চোখের ও মনের ভাষা পড়ে ফেলে। সারা রাত মাহমুদের ঘুম হয়নি, অপ্সরার চোখে মাহমুদের জন্য ইতিমধ্যে একটি জায়গা তৈরি হয়ে গেছে তা সে বুঝতে পারছে। তবে তার চিন্তা অপ্সরা কি পারবে তার বাবার বিরুদ্ধে কদম তুলতে?

অন্যদিকে অপ্সরারও একই অবস্থা। কেন জানি মাহমুদকে অপ্সরার খুব ভালো লেগেছে। অচেনা লোকটিকে দেখে খুবই আপন মনে হয়েছে। এক সপ্তাহ পর সকালবেলায় অপ্সরার ফোন পেল মাহমুদ। অপ্সরা মাহমুদকে বেলা ১১টায় চন্দ্রিমা উদ্যানে আসতে বলল। মাহমুদ সময়মতো হাজির। একটু পরেই বান্ধবী লিসাকে নিয়ে অপ্সরা এল। তারপর অনেক কথা, ভবিষ্যতের অনেক পরিকল্পনা, সবকিছু আপনমনে দুজন দুজনের সঙ্গে শেয়ার করল। অপ্সরা মাহমুদকে কথা দিল সে তার বাবাকে যেভাবেই হোক এ বিয়েতে রাজি করাবে। তারপর নিয়মিত দুজনের মধ্যে টেলিফোনে আলাপচারিতা হয়। একদিন আবিদ সাহেব টেলিফোনে দুজনের আলাপচারিতার বিষয়টি সরাসরি জেনে গেলেন। কোনো কারণে তিনি সেদিন অফিসে যাননি। মাহমুদের টেলিফোন রিসিভ করল অপ্সরার বাবা। মাহমুদ ভুল করে অপ্সরাকে চেয়ে বসল। তারপর যা হওয়ার তাই। অপ্সরাকে চাপ দিতেই সে সবকিছু গড় গড় করে বলে দিল-কীভাবে পরিচয় হলো, কে পরিচয় করিয়ে দিল-সব, সবকিছু। এ কারণে মাসুদ ভাইয়ের পরিবারের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটাও নষ্ট হয়ে গেল। মাহমুদের পক্ষ হয়ে অপ্সরা অনেক পজেটিভ দিক তুলে ধরল এবং আর কোনো উপায় না দেখে মাহমুদের প্রতি তার ভালোবাসার কথাটিও জানাল বাবাকে। কিন্তু তিনি এতে আরও তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি বিশ্বাস করলেন অপ্সরা ও মাহমুদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক অনেক দিনের পুরোনো। অপ্সরাই প্ল্যান করে আত্মীয় মাসুদকে দিয়ে আবিদ সাহেবের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে তাদের এই ভালোবাসাটা জায়েজ করে নেওয়ার জন্য। তারপর থেকে অপ্সরার কোচিংয়ে যাওয়া, বাইরে বের হওয়া ও ফোন ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলো। ঘরের ফোনসেটটি আবিদ সাহেব লক করে দিলেন। বলা যায়, এক প্রকার ঘরের মধ্যেই বন্দী করে রাখা হলো অপ্সরাকে।

আরও কিছুদিন এভাবে কাটল। এরই মধ্যে দুজন দুজনকে দেখার জন্য পাগলপ্রায়। ২০০১ সালের ১৪ ফেব্র“য়ারি। কোনো কারণে দিনব্যাপী হরতাল। আজ আর প্রাণ মানে না। মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে অপ্সরা বের হয়ে পড়ল। বাসার কাছেই টেলিফোন বুথ থেকে মাহমুদকে ফোন করে বাসায় আসার জন্য বলল। মাহমুদ অপ্সরার ডাকে ছুটে আসে। অপ্সরা তার মাকে বলে, ‘মা, কোনো সিনক্রিয়েট করবে না। আমি মাহমুদের সঙ্গে বিকেল চারটা পর্যন্ত আজ বাইরে থাকব। আব্বু অফিস থেকে বাসায় ফিরে আসার আগেই আমি ফিরে আসব।’ অপ্সরার মা অপ্সরার চলে যাওয়ার দিকে শুধুই ফ্যাল ফ্যাল করে থাকিয়ে রইল, কিছুই বলতে পারল না মেয়ের এমন পাগলপণ ভালোবাসা দেখে।

একটি রিকশা নিয়ে দুজনে ভালোবাসা দিবসে আজ অনেক ঘোরাঘুরি করল। অনেক না-বলা কথা বলা হলো, অনেক ভালোবাসায় সিক্ত হলো দুজনে। এবার বাসায় ফেরার পালা, মিরপুর রোড ধরে রিকশা চলছে। মাঝপথে একটি দোকান থেকে মাহমুদ ১৪টি টকটকে লাল গোলাপ কিনে নিল। রিকশায় দুজনে গা-ঘেঁষে বসা, মাহমুদ অপ্সরার হাতটি তার নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলো। তারপর ১২ বছর আগলে রাখা হাতের আংটিটি খুলে অপ্সরার আঙুলে পরিয়ে দিল। এবং আদর করে অপ্সরাকে বলল এই ১৪টি লাল গোলাপকে সাক্ষী রেখে এই ভালোবাসা দিবসে অপ্সরা তোমাকে সারা জীবনের জন্য আমার করে নিলাম। আজ থেকে পৃথিবীর এমন কোনো শক্তি নেই, যে তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে। এখন থেকে তুমি আমার, শুধুই আমার অপ্সরা। অপ্সরার চোখে তখন আনন্দাশ্রু বয়ে যাচ্ছে। পরের ঘটনাগুলো খুব তাড়াতাড়িই ঘটতে লাগল। একদিকে অপ্সরার মায়ের চাপ ও অন্যদিকে মেয়ের আংটি হাতে নেওয়ার ঘটনা শুনে আবিদ সাহেবের মনে এক ধরনের জেদ চেপে গেল। হঠাৎ তিনি অপ্সরাকে মাহমুদের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি হয়ে গেলেন এবং সঙ্গে নতুন একটি শর্ত জুড়ে দিলেন। এই নতুন শর্ত দিয়ে তিনি মাহমুদকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করলেন।

সকালবেলা মাহমুদ অফিসে যাওয়ার জন্য রেডি হয়ে বের হবেন, ঠিক ওই মুহূর্তে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে দরজার কড়া নাড়লেন। তিনি সোজা রুমের ভেতরে ঢুকে বললেন, 'আমাকে অপ্সরার বাবা পাঠিয়েছেন। আপনি অপ্সরাকে "আংটি" পরিয়ে আপনার বউ বলে মনে মনে কবুল করে নিয়েছেন, বিষয়টি অপ্সরার বাবা আজ জেনে গেছেন। সুতরাং আংটি গ্রহণের দিন থেকে অপ্সরা আপনারই বউ, এখন শুধু কলেমা পড়া বাকি। এবং এই কলেমা পড়ে আজ সূর্যাস্তের আগেই অপ্সরাকে ওই বাড়ি থেকে আপনাকে নিয়ে আসতে হবে। কারণ, আবিদ সাহেব আর এক দিনের জন্যও আপনার বউকে তাঁর ঘরে রাখবেন না। এটা তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আরও শোনেন, আপনি আজ যদি অপ্সরাকে কলেমা পড়ে নিজের বউ করে ঘরে আনতে না পারেন, তবে চিরদিনের জন্য অপ্সরাকে ভুলে যেতে হবে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে অপ্সরার অন্যত্র বিয়ে দেওয়া হবে, পাত্রও রেডি আছে।'

মাহমুদ এ মুহূর্তে কী করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। আকাশটা যেন তার মাথার ওপর ভেঙে পড়ল। বিয়ের প্রস্তুতির জন্য মাত্র দুই দিনের সময় চেয়েছিল মাহমুদ কিন্তু তাও মেলেনি। আনুষ্ঠানিকতা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব বাদ দিয়ে কীভাবে সে একা একা বিয়ে করবে? মাহমুদ চট্টগ্রামে তার মা-বাবার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলল এবং আলোচনায় উঠে এল এত অল্প সময়ে চট্টগ্রাম থেকে কারও ঢাকায় আসা সম্ভব নয়। বাবা-মা ছেলের ভালোবাসার কথা চিন্তা করে বিয়েতে অনুমতি দিয়ে দিল। বলল, 'তুই যে কাউকে সঙ্গে নিয়ে বউমাকে নিয়ে আয়।' বিয়ের আনুষঙ্গিক কিছু কেনাকাটা এবং সাক্ষী হিসেবে মাসুদ ভাই ও এক বন্ধুকে নিয়ে বিকেলে মাহমুদ অপ্সরাদের বাসায় গিয়ে হাজির। বাসায় ১০-১২ জন খুব কাছের আত্মীয় স্বজনকে দাওয়াত দিয়েছিলেন আবিদ সাহেব অন্য কোনো অনুষ্ঠানের কথা বলে। আবিদ সাহেব ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করেননি মাহমুদ তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সব আনুষ্ঠানিকতা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব বাদ দিয়ে এভাবে বিয়ে করতে চলে আসবে।

ততক্ষণে বিষয়টি ঘরে আসা অন্য মেহমানেরা জেনে গেল। বাধ্য হয়ে আবিদ সাহেব কাজি ও মৌলভি ডেকে বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। অপ্সরার বিদায় বেলায় আবিদ সাহেব মাহমুদকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। বললেন, 'বাবা, আমি তোমার ভালোবাসার কাছে হেরে গেলাম। আমার একমাত্র মেয়েকে আমি চোখের আড়াল করে এত দূরে বিয়ে দিতে চাইনি। তুমি আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সব আনন্দ-উৎসবকে বিসর্জন দিয়ে প্রমাণ করলে, আমি অপ্সরাকে যতটুকু ভালোবাসি, তার চেয়েও তুমি বেশি ভালোবাসো। আমার বিশ্বাস, আমার অপ্সরা তোমার কাছে সুখেই থাকবে। তোমরা সুখী হও বাবা, সুখী হও... পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো।'

ভালোবাসা দিবসের ঠিক ১৭ দিন পরে মাহমুদ আর অপ্সরা সারা জীবনের জন্য একে অপরের কাছে চলে এল। আরও একবার জয় হলো ভালোবাসার। এই হলো মাহমুদ আর অপ্সরার ভালোবাসার গল্প।

চিঠি

বাবার কাছে খোলা চিঠি

মঞ্জুরুল হক

শ্রদ্ধেয় বাবা,

আমি জানি, এ চিঠি তুমি পড়বে না। আজ পৌষের ষষ্ঠ দিন, বাবা। এ দিন তোমার কাছে অনেক আনন্দের ছিল। মা পিঠা বানাত কত রকমের। সেই মা এখন আর পিঠা বানায় না, কোনো দিন আর বানাবে না। কত কিছু খেতে ইচ্ছা করে মায়ের হাতে, কিন্তু আল্লাহ সে সৌভাগ্য আমাদের সবার কপাল থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন। মায়ের দিকে তাকালে কান্নায় বুকের পাঁজর ছিঁড়ে যায় বাবা। বলতে পার মানুষ কেন বৃদ্ধ হয়? কেন ব্রেনস্ট্রোক হয়? আমি জানি না বাবা। আল্লাহ যেন আমাকে কোনো অসুখে না ভুগিয়ে নিয়ে যান।

তোমার মনে আছে, আষাঢ় মাসে আমাদের খাবারের খুব কষ্ট হতো? আমাদের জমিতে যে ধান হতো নয় ভাইবোন, তুমি, মা ১১ জনের সংসারে আষাঢ় মাসে ধান ফুরিয়ে যেত। বৃষ্টির মধ্যে ভিজে তুমি বাজারে যেতে। মা তোমার জন্য চুলার পাশে বসে অপেক্ষা করত, কখন তুমি আস। মনে আছে বাবা, একবার নৌকা ডুবে কয়েকজন মারা গিয়েছিল, তুমিও সে নৌকায় ছিলে। সারারাত আমি, মা সবাই কি কান্নাই না করেছিলাম।

বাবা একবার বর্ষায় আমি, তুমি সেলিম ভাই, জিল্লু ভাই নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে ইয়া বড় এক কাতলা পেয়েছিলামÑকি খুশি হয়েছিলাম তাই না বাবা।
এখনো আমার হাসি পায় কথাটা মনে পড়লে।
বাবা তোমার কি মনে আছে ক্লাস ফাইভে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেলাম সারা গ্রামে তোমার কাঁধে চড়ে ঘুরেছিলাম? হেডমাস্টার স্যারকে জড়িয়ে ধরে তুমি কেঁদেছিলে।

বাবা তুমি প্রতি ঈদে আমাকে বেশি টাকা দিতে এ জন্য সেলিম ভাই তোমার সঙ্গে রাগ করে উঠানের ধুলায় গড়াগড়ি করে কান্না করত। আমি হাসতাম। তুমি জানতে, ইলিশ মাছ আমি খুব পছন্দ করতাম। বড় মাছটাই মাকে তুমি আমাকে দিতে বলতে। বাবা আমাদের ছনের ঘর ভেঙে টিনের ঘর ওঠালে দুদিন আনন্দে ঘুমায়নি। বাবা তোমার মনে আছে, যেদিন তোমার ব্লাড ক্যানসার ধরা পড়ল সেদিন কি কান্নাই না করেছিলাম। হাসপাতালের বিছানায় তোমাকে যখন দেখতাম, বিশ্বাস কর বাবা এই বুকের মধ্যে সমুদ্রের পানি জমত। জানি, তুমি বুঝতে। বাবা আমি ভালো নেই। সবাই কেমন যেন স্বার্থপর হয়ে গেছে। তুমি আমার জন্য একটু দোয়া কর বাবা। মায়ের শরীরটাও ভালো না বাবা। ব্রেনস্ট্রোকের পর মাকে নিয়েও দুশ্চিন্তা হয় বাবা। রাতে মায়ের চিন্তায় একটুও ঘুমাতে পারি না। মা-ও যদি তোমার কাছে চলে যায়, কী নিয়ে বেঁচে থাকব বাবা? কার কাছে আমার মনের কথাগুলো শেয়ার করব? ও, বলতে ভুলে গেছি বাবা, আমার ছেলে সমুদ্রের হাত, পায়ের আঙুলগুলো না তোমার মতো হয়েছে। আমি ওর মাঝেই তোমাকে খুঁজে পায়।

তুমি ভালো থেকো বাবা।

যুগের মুসলিম সভ্যতার কালজয়ী নিদর্শন: ক্যালিগ্রাফি বা wjwcKjv

নেটপোকা

খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়ের পর আরব উপদ্বীপের সীমানা পেরিয়ে তা ছড়িয়ে পড়ে প্রায় তিন মহাদেশজুড়ে। মধ্য এশিয়া থেকে উত্তর আফ্রিকা হয়ে পশ্চিম ইউরোপ পর্যন্ত we¯ত হয় mwekvj gmwjg mvgvR¨| Ávb-weÁvb I wkí-সাহিত্যে তখন দুনিয়াজুড়ে মুসলমানদের জয়জয়কার। মধ্যযুগে কয়েক শতাব্দী ধরে ক্যালিগ্রাফি মুসলিম শিল্পকলার অন্যতম প্রধান শাখা হিসেবে গড়ে উঠেছিল। বিশ্বব্যাপী শিল্পকলার ইতিহাসে মধ্যযুগের ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি আজও এক অনন্য স্থান দখল করে রেখেছে। ইংরেজি 'calligraphy' কথাটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'kalligraphia' থেকে, যা 'kallos' (সৌন্দর্য) ও 'graphein' (লেখা) শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। সুতরাং, একে বাংলায় 'নান্দনিক হস্তলিখন পদ্ধতি' বা সংক্ষেপে 'লিপিকলা' বলা যেতে পারে। মানবেতিহাসে লিখিত ভাষার জন্মের সমান্তরালেই লিপিকলার জন্ম হয়েছিল। প্রাচীন মিসরীয় হায়ারোগ্লিফিকসের নান্দনিক শিলালিপি আজও সে সাক্ষ্য দেয়। আর ইসলামি লিপিকলার জন্ম ও প্রসার ঘটেছিল ইসলাম ধর্মের জন্ম ও প্রচারের পাশাপাশি। বস্তুত আরবি ভাষায় লিখিত মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরআনের অনুলিপি তৈরি ও প্রচারের প্রয়োজনেই ইসলামি লিপিকলা বিকশিত হয়েছিল। তবে পরবর্তীকালে এর ব্যবহার কেবল ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং মুসলিম স্থাপত্য, সিরামিক, কাচ ও মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প, বয়নশিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমে এই লিপিকলা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

আরবি বর্ণমালা ব্যবহৃত হওয়ার কারণে সাধারণভাবে এই লিপিকলাকে আরবি লিপিকলা (Arabic calligraphy) বলা হয়। তবে মধ্যযুগে চীন থেকে মরক্কো পর্যন্ত we¯ত মুসলিম সাম্রাজ্যে আরবি ছাড়াও ফারসি, উর্দু, তুর্কি, উজবেক, কাজাখসহ বিভিন্ন ভাষা লেখার ক্ষেত্রে আরবি বর্ণমালা ব্যবহৃত হতো বলে একে Bmjvg wjwcKjv ejvই বেশি যুক্তিসংগত। ইসলামের প্রথম যুগে কোরআন লিপিবদ্ধ করার কাজে কুফীয় (Kufic) ধাঁচের আরবি হস্তলিপির উদ্ভব ঘটে। এই লিখনপদ্ধতিতে আরবি হরফের আকৃতি জ্যামিতিক, জমকালো ও আলংকারিক ধাঁচের হওয়ায় মধ্যযুগের মুসলিম স্থাপত্যকলায়ও এর বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। wLóxq `kg kZvãx chন্ Kdxq n¯লিপির প্রাধান্য বজায় ছিল। বর্তমানে ইরান ও ইরাকের পতাকা এই হস্ত লিপি ধারণ করছে।

বিভিন্ন শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছে দামেস্ক, বাগদাদ, ইস্পাহান, ইস্v¤jmn বিভিন্ন শহরে। বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় সাম্রাজ্যের শাসকদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে এসব শহi cwiYZ হয়েছিল জ্ঞান-weÁvb I wkí-সাহিত্যের একেকটি প্রাণকেন্দ্রে। ইসলামি লিপিকলার বিকাশ ও বিবর্তনও ঘটেছে তাই বিভিন্ন শাসনামল ও রাজধানীকে কেন্দ্র করে। উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে কোরআন লিখন ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে আরবি বর্ণমালার ব্যবহারের প্রয়োজনে নাস্খ, তালিক, নাস্wjK, gnv°vK, wiKvn, দিওয়ানি ইত্যাদি বিভিন্ন ধাঁচের হস্তলিপির উদ্ভব হয়। সর্বশেষ উসমানীয় শাসনামলে ইসলামি লিপিকলার চরম উন্নতি ঘটে। বিভিন্ন ধাঁচের আরবি হস্তলিপির সঙ্গে অ্যারাবেস্ক (arabesque) bvgK R¨vwgwZK bKkv ব্যবহার করে নকশাবিদেরা নান্দনিক লিপিকলা সৃষ্টি করতেন। মধ্যযুগের নামকরা মুসলমান ক্যালিগ্রাফারদের মধ্যে ইবনে মুকলাহ, ইবনে আল বাওয়াব, ইয়াকুত আল মুস্তাসিমি, মীর আলী তাবরিজি, শেখ হামদুল্লাহ ও nwdR Dmgvb Ab¨Zg|

ইসলামি লিপিকলার চর্চায় মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন জিনিস ব্যবহৃত হয়েছে। মুসলিম সাম্রাজ্যে কাগজের ব্যবহার শুরু হওয়ার আগে কোরআন লিপিবদ্ধ করার কাজে প্রথম দিকে প্যাপিরাস ও পার্চমেন্ট ব্যবহৃত হতো।

পরবর্তীকালে কোরআন লেখার কাজে কাগজের ব্যবহার শুরু হলে তা ইসলামি লিপিকলার ক্ষেত্রেও বিপ্লব ঘটায়। ইসলাম ধর্মের নবী মুহাম্মদ (সা)-এর হাদিস ও তাঁর প্রতি প্রশংসাবাণী লেখার কাজেও লিপিকলা ব্যবহৃত হতো। বিশেষ করে উসমানিয়া শাসনামলে রাসুল (সা.)-এর হাদিস ও প্রশংসাবাণীর নান্দনিক প্রকাশের ব্যাপক চর্চা হয়েছিল। নিচে খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে উসমানীয় শাসনামলে লিখিত কোরআনের একটি পাতা এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে উসমানীয় শাসনামলে রচিত রাসুলের প্রশংসাবাণীর একটি ছবি দেওয়া হলো।

ইসলামি লিপিকলার আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যবহার ছিল ধাতব মুদ্রা তৈরিতে। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমান খলিফারা সোনা ও রুপার মুদ্রায় মানুষ কিংবা প্রাণীর ছবির বদলে লিপির ব্যবহার চালু করেন। সে যুগের বিভিন্ন মুসলিম সাম্রাজ্যের মুদ্রায় সাধারণত কোরআনের বাণী ও অন্যান্য ধর্মীয় কথা উৎকীর্ণ থাকত। নিচে তিনটি ভিন্ন মুসলিম সাম্রাজ্যের তিনটি ধাতব মুদ্রার ছবি দেওয়া হলো। প্রথমটি উমাইয়া খলিফা হিশামের (729-৭৩০ খ্রিষ্টাব্দের) রুপার দিরহাম, দ্বিতীয়টি মোগল সম্রাট শাহজাহানের (১৬২৮-১৬২৯ খ্রিষ্টাব্দের) সোনার মোহর এবং তৃতীয়টি উসমানীয় খলিফা তৃতীয় আহমেদের (১৭২৫-১৭২৬ খ্রিষ্টাব্দের) সোনার জার-B-মাহবুব নামের মুদ্রা। সময়ের সঙ্গে মুদ্রাগুলোর মান ও লিপিকলার উৎকর্ষের দৃষ্টান্ত j¶Yxq|

মধ্যযুগের মুসলমানরা নানা ব্যবহার্য জিনিসপত্রেও লিপিকলার নান্দনিক প্রয়োগ ঘটিয়েছিল। ইসলামি লিপিকলার সবচেয়ে সুন্দর প্রয়োগ ঘটেছিল মুসলমানদের নির্মিত বিভিন্ন ধরনের স্থাপত্যে। বিশেষ করে gmwR`, mমাধিসৌধ ও প্রাসাদের অলংকরণে ক্যালিগ্রাফির অসাধারণ ব্যবহার মুসলিম স্থাপত্যকলাকে একটি অনন্য ও অতুলনীয় শিল্পমাত্রা দিয়েছিল। ইসলাম ধর্মে মানুষ কিংবা অন্যান্য প্রাণীর ছবি আঁকা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই লিপিকলানির্ভর অলংকরণশৈলীর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। যেখানে খ্রিষ্টানরা তাদের wগর্জা সাজাত মাতা মেরি, যিশুখ্রিষ্ট বা সন্দের ছবি কিংবা মূর্তি দিয়ে, সেখানে মুসলমানরা মসজিদের ভেতরে-বাইরে অলংকরণ করত অ্যারাবেস্ক মোটিফ, লতাপাতার নকশা ও আরবি বর্ণমালাভিত্তিক অনিন্দ্যসুন্দর শিল্পকলার সাহায্যে। নান্দনিক লিপিকলা ব্যবহার করে মসজিদের দরজা, দেওয়াল, ছাদ, গম্বুজ ইত্যাদিতে কোরআনের বাণী উৎকীর্ণ করা হতো। সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত ইরানের ইস্পাহান শহরের শেখ লুতফুল্লাহ মসজিদের অনন্যসাধারণ লিপিকলা আজও সবাইকে অভিভূত করে। একইভাবে মুসলমান শাসকেরা তাঁদের প্রাসাদ অলংকরণেও ইসলামি লিপিকলা ব্যবহার করেছেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে নির্মিত স্পেনের গ্রানাডাq অবস্থিত সুবিখ্যাত আল-হামরা প্রাসাদের অনুপম স্থাপত্যকলা ও ক্যালিগ্রাফির কোনো তুলনাই হয় না। নিচে Avj-হামরা প্রাসাদ এবং এর স্থাপত্যকলা ও লিপিকলার কয়েকটি ছবি দেওয়া হলো।

মধ্যযুগের গৌরবময় মুসলিম সাম্রাজ্যগুলো আর নেই। তবে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সভ্যতার বহু কালজয়ী নিদর্শন AvRI রয়ে গেছে। ইসলামি লিপিকলা বা ক্যালিগ্রাফি এর অন্যতম।

মধ্যযুগে মিনার, মাদ্রাসা, সমাধিসৌধ ইত্যাদির অলংকরণেও ইসলামি লিপিকলার নান্দনিক প্রয়োগ ঘটেছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত দিল্লির কুতুবমিনার ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত উজবেকিস্তানের সমরখন্দে অবস্থিত তৈমুর লংয়ের গোর-B-Awgi mgাধিসৌধ আজও মধ্যযুগে ইসলামি লিপিকলার চরম উৎকর্ষের দৃষ্টান্ enb করছে।

বাইসাইকেল

রিপন ঘোষ

উদাস নয়নে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে অভি। নীল আকাশে ভেসে থাকা কালো মেঘেদের সঙ্গে যেন ওর ভীষণ বন্ধুত্ব। এ এমনই গভীর বন্ধুত্ব যে সব কালো মেঘ যেন ওর মলিন বদনে এসে জমা হয়েছে। তার দুই চোখের কোণ জলে ভিজে ওঠে, ইচ্ছে হয় হাউমাউ করে কাঁদে। তার কাছে মনে হয় বাবাটা খুব স্বার্থপর, তাকে মোটেও ভালোবাসে না।

আজ কত দিন থেকে সে বাবাকে বলছে একটা বাইসাইকেল কিনে দেওয়ার জন্য। কিন্তু বাবা আজ-কাল করতে করতে আর কিনে দিচ্ছেন না। পাশের বাড়ির হিমেল রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় জোরে জোরে বেল বাজিয়ে তাকে শুনিয়ে যায়। বাইসাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দ শুনলে ওর মনটা আরও খারাপ হয়ে যায়।

বেশ কয়েক দিন আগে সে হিমেলের সাইকেলে চড়তে চেয়েছিল, কিন্তু হিমেল অভিকে সাইকেলে চড়তে দেয়নি। বাইসাইকেল থেকে জোর করে নামিয়ে দিয়ে বলেছিল, তোর বাবাকে বল না একটা কিনে দেওয়ার জন্য, শুধু শুধু আমারটা নিয়ে টানাটানি করছিস কেন! সে কেঁদে কেঁদে বাসায় ফিরে আসে। বাসায় এসে বাবার কাছে আবদার ধরে, ওকে একটা বাইসাইকেল কিনে দিতেই হবে।

অভির বাবা রিফাত সাহেব সদা হাস্যোজ্জ্বল একজন মানুষ। এমন প্রাণোচ্ছল হাসি সচরাচর কারও মুখে দেখা যায় না। শত সংকটেও তাঁর মুখ কালো দেখা যায় না। তাঁর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি কোনো কিছুতেই না করেন না। তাঁকে যদি কেউ বলে আকাশের চাঁদ এনে দেওয়ার জন্য, তাহলে তিনি এমনভাবে কথা বলবেন যেন একটু পরই তিনি ওটা এনে দিচ্ছেন। অভিকেও তিনি কথা দিয়েছেন একটা বাইসাইকেল কিনে দেবেন, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে না টাকার অভাবে। দ্রব্যমূল্যের আগুনে পুড়ে সংসারের অবশ্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে আর অন্য কিছুর কথা চিন্তাই করা যায় না। মাসের ১০ দিন বাকি থাকতেই সব টাকা শেষ হয়ে যায়। মাসের শেষের দিকে তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখও যেন কিছুটা আঁধারে ঢেকে যায়। সংসারের কেউ হঠাৎ করে অসুস্থ হলে তাঁকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার মতো টাকাও তখন থাকে না।

কয়েক দিন থেকে রিফাত সাহেব অভির থেকে দূরে দূরে থাকেন। সেই সকালে বাসা থেকে বেরিয়ে যান আর ফেরেন বেশ রাত করে। তিনি ফিরে আসার আগেই অভি ঘুমিয়ে যায়। ঘরে ঢুকে ছেলেটার মায়াবী মুখের দিকে তাকিয়ে মনটা কেমন করে ওঠে। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, অভি খেয়ে ঘুমিয়েছে কি না। জুলিয়া জানান, অভি না খেয়ে, কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। এবার রিফাত সাহেবের মন বেশ খারাপ হয়ে যায়। নিজের ওপর ভীষণ রাগ হয়।

তিনি নিজেকে ধিক্কার জানান, তুমি কেমন বাবা! ছেলে তো খুব বড় কিছু আবদার করেনি, কিন্তু তুমি তা দিতে পারছ না। তোমার তো বাবা হওয়ার কোনো অধিকার নেই।

জুলিয়া স্বামীর পাশের চেয়ারে বসে বলেন, আজ কি হয়েছে জানো? রিফাত জুলিয়ার দিকে তাকান। জুলিয়া বলতে শুরু করেন, আজ দুপুরে এক আইসক্রিমওয়ালা এসেছিল। অভি আমার কাছে এসে বলল, মা আমাকে পাঁচটা টাকা দাও না, আইসক্রিম খাব। মাস শেষ হতে দুদিন বাকি, ঘরে একটি টাকাও নেই। আমি বললাম, বাবা ঘরে তো টাকা নেই। সে কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করে বাইরে চলে গেল। আমি ওর পেছন পেছন গেলাম। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম অভি আইসক্রিমওয়ালাকে বলছে, এই যে আইসক্রিম মামা, তুমি এখানে থাকো না, আমার বাবা এলেই তোমাকে টাকা দিয়ে দেব। আইসক্রিমওয়ালার কি হলো জানি না, সে অভির দিকে একটা আইসক্রিম বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এই নাও, টাকা লাগবে না। কিন্তু অভি টাকা না দিয়ে আইসক্রিম নিতে রাজি হয় না। সে বারবার বলে, তুমি আরেকটু থাকো না, আমার বাবা এখনই চলে আসবে। আইসক্রিমওয়ালা আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেল আর অভি ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। এটা দেখে আমার বুক ফেটে যেন কান্না আসতে চায়।

অনেক দিন পর রিফাত সাহেবের চোখ পানিতে ভরে ওঠে। ছেলে তার বাবার ওপর কত বিশ্বাস করে, কত নির্ভর করে, কিন্তু তিনি ছেলের জন্য কিছুই করতে পারেন না। তিনি ঘুমন্ত অভির মাথায় হাত রেখে বলেন, বাবারে, দরকার হলে আসছে মাসে না খেয়ে হলেও তোকে আমি সাইকেল কিনে দেব। তিনি অভিকে টেনে তোলেন খাওয়ানোর জন্য। রিফাত সাহেব ঘুমন্ত অভিকে মুখে তুলে ভাত খাওয়াচ্ছেন। অভি ঘুমের মধ্যে বুঝতেই পারছে না সে খাচ্ছে। অভির মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনটা ভালো হয়ে যায়।

আজ খুব সকালে ঘুম থেকে উঠল অভি। একটু একটু করে পুবাকাশে প্রভাতের লাল সূর্য উদিত হচ্ছে। অভির কাছে ব্যাপারটা খুব আশ্চর্য লাগে! সারা দিন সূর্যটা হলুদ-সোনালি থাকলেও সকালে সূর্যের রঙ কেন লাল হয়! বারান্দার পাশের একটি গাছে কি একটা পাখি ডেকে যাচ্ছে। ভীষণ ভালো লাগছিল অভির কাছে। তার মাঝেমধ্যে মনে হয়, সে যদি পাখি হতে পারত, তবে উড়ে দূরে কোথাও চলে যেত। হঠাৎ পেছন থেকে রিফাত সাহেব ডেকে বলেন, কিরে অভি, এত সকাল এখানে কী করছিস? অভি একটু অভিমানী ভাব করে কোনো কথা বলে না। সে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। রিফাত সাহেব কাছে এসে তার গালে আলতো করে টিপে বলেন, বাবার ওপর রাগ করেছিস? আর রাগ করতে হবে না, আজই তোকে বাইসাইকেল কিনে দেব। অভির কাছে কথাটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। বাবা তো আর কোনো কিছুতেই না করে না, আজও হয়তো আশা দিচ্ছে।

তিনি অভিকে কাঁধে তুলে বলেন, আজ আর মিস হবে না। আজ রাতেই তোর সাইকেল পেয়ে যাবি। অভি বুঝতে পারে না বাবা কতটুকু সত্য বলছেন। তবে বাবা এমন সুন্দর করে কথা বলে, বিশ্বাস না করে থাকা যায় না। অভির মুখে সামান্য হাসি ঝিলিক দিয়ে যায়।

রিফাত সাহেব অফিসে প্রথমেই বসের রুমে গিয়ে ঢোকেন। কাজের আলাপ শেষে আমতা আমতা করে আসছে মাসের বেতনটা চান। তখন বস বলেন, কী বলেন এইটা! মাস শেষ হতে এখনো বাকি, আর আপনি বেতন খুঁজছেন! আপনার কি কোনো আক্কেল জ্ঞান নেই? মাস শেষ হোক, বেতন পাবেন।

বিমর্ষ মুখে বসের রুম থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন। নিজের টেবিলে বসতে গিয়েও পারেন না। পাশের রুমের গিয়াস সাহেবের কাছে সব বলে কিছু টাকা ধার চান। কিন্তু মাসের শেষ দেখে উনিও দিতে পারলেন না। এবার তাঁকে সত্যিই বিপর্যস্ত দেখায়। অভির মুখ চোখে ভাসতেই তিনি আরও চিন্তিত হয়ে পড়েন। ছেলেটাকে কত আশা দিয়ে এসেছেন। না আর কিছু তিনি ভাবতে পারছেন না।

অফিস ছুটি হওয়ার অনেক আগে তিনি বেরিয়ে গেলেন। এখন একমাত্র আশা কাজেম ভাই। তিনি সুদে টাকা ধার দিয়ে থাকেন। তিনি কাজেম ভাইয়ের বাসার দিকে হাঁটা ধরলেন। কাজেম ভাইয়ের কাছ থেকে হাজারে ২০০ টাকা সুদে চার হাজার টাকা আনলেন। সুদের পরিমাণটা হয়তো বেশি, কিন্তু এই সময়ে এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

বাইসাইকেলের দোকান থেকে একটি সুন্দর ছোট্ট বাইসাইকেল নিয়ে বাসার দিকে রওনা দিলেন। অভির হাসিমাখা মুখ ভাবতেই তার মনটা ভরে গেল। রিকশাওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে বাসার দরজায় নক করতেই দরজা খুলে দিল অভি। সে যেন বিশ্বাস করতেই পারছে না বাবা তার জন্য সাইকেল নিয়ে এসেছেন। রিফাত সাহেব মিটিমিটি হাসছেন। অভি লাফ মেরে লাল রঙের সাইকেলটায় চড়ে বসল। অভির আনন্দ আর খুশিতে পুরো ঘর যেন ১০০০ ওয়াটের বাতির উজ্জ্বল আলোতে ভরে উঠেছে। অভির আনন্দে রিফাত সাহেব আর জুলিয়াকে ভীষণ তৃপ্ত দেখায়। এখন যদি এক মাস খেতে না-ও পারেন, তাহলেও কষ্ট হবে না। দুজনের চোখে আনন্দাশ্রু খেলা করতে থাকে।

দুঃস্বপ্ন

নষ্ট কবি

লোপা আহসানের জন্য আজ একটি বিশেষ দিন। ঘুম থেকে উঠে তাই সোজা প্রবেশ করলেন তাঁর ল্যাবরেটরিতে, যেখানে একটি বিশেষ ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছেন সাতজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। সবাই চেয়ে আছেন একটা বানরীর দিকে বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে। সেই বানরীর প্রথমবারের মতো সন্তান হতে চলেছে। প্রক্রিয়াটির সঙ্গে মানব সন্তান জন্মগ্রহণের কোনো পার্থক্য নেই। শুধুই একটাই পার্থক্য টেনে এনেছে পৃথিবীর ভিন্ন প্রান্ত থেকে সাতজন বিজ্ঞানীকে এই গোপন ল্যাবরেটরিতে। আর সেটা হলো এই বানরীর থেকে এই প্রথমবার জন্ম লাভ করবে মানবসন্তান।

ক্লোনিং প্রক্রিয়াটি অতীত পৃথিবীতে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল শুধু মানব প্রজাতির ধ্বংসের কারণ হতে পারে এই ভেবে। ক্লোনিংয়ের প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞানী রিচার্ড সিড ১৯৯৭ সালে ঘোষণা করেছিলেন নিজের মৃতা স্ত্রীর ক্লোনিং করবেন। কিন্তু আমেরিকা এবং জাপানের অসহযোগিতা এবং বাধার ফলে সেই বিজ্ঞানীকে বরণ করে নিতে হয় স্বেচ্ছা মৃত্যু। কিন্তু তাঁর ইচ্ছার মৃত্যু ঘটেনি। তাই সেই ঘটনার প্রায় ২০০ বছর পর লোপা আহসানের হাত ধরে সাতজন বিজ্ঞানী কাজ করেছেন নিরলসভাবে। যেসব তথ্য ও উপাত্ত ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল, সেই সব তথ্যকে আবার গবেষণা করে একত্র করেছেন এই সাতজন বিজ্ঞানী। তাঁরা তারপর মানুষ জন্ম দানের চেষ্টা করে চলেছেন। এই প্রচেষ্টার নবম বছরে তাঁরা মানুষ থেকে মানুষের জন্ম না দিয়ে মানবসন্তান বানর কিংবা শিম্পাঞ্জি থেকে করার সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সামনে প্রসব বেদনায় কাতর এই বানরী তিন নম্বর সাবজেক্ট। আর এই বানরীর থেকে মানব সন্তান হবে বহুল প্রতিক্ষিত ক্লোন মানব সন্তান।

অস্ট্রেলিয়ার গহিন জঙ্গল থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল এই বানরীকে পাঁচ মাস আগে। তারপর এর মধ্যে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে মানব শুক্রাণু। লোপা আহসানের স্বামী ড. আদিল আহসানের শরীরের কোষের সঙ্গে তাঁর শুক্রাণুর নিউক্লিয়াস মিলিয়ে জেনেটিক মিক্সিংয়ের মাধ্যমে বানানো সেই শুক্রাণু প্রবেশ করানো হয় সেই বানরীর জরায়ুতে। সেখানে তিলে তিলে বেড়ে উঠেছে এই সন্তান। ডিম্বাণু হিসেবে নেওয়া হয়েছে বানরীর ভ্রুণ, কিন্তু সেই ডিম্বাণু মানব শুক্রাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে নিষিক্ত হওয়ার পর মানব শুক্রাণুর ডিএনএর ওপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া করতে পারেনি। বিশেষত মানব সন্তানটির জন্মর পর কিছু কিছু স্বভাব বানরীর জিন থেকে এলেও মানব প্রকৃতিই হবে সন্তানটির গঠনের পরিচায়ক।

এর মধ্যে আল্ট্রাভিশনোগ্রাফিতে মানব সন্তানটিকে ছেলে হিসেবে শনাক্ত করা গেছে। এই প্রক্রিয়ায় অনেক বিপদের আশঙ্কা ছিল। প্রায় ৯০ বছর আগে পৃথিবীর সব কয়টা আল্ট্রাভিশনোগ্রাফি মেশিন বন্ধ করে দেওয়া হয়। ধ্বংস করে দেওয়া হয় অনেকগুলো। কারণ, সেই সময় মায়েদের পেটের সন্তান ছেলে নাকি মেয়ে, এটা দেখার জন্য মুখিয়ে থাকত সবাই। একসময় মেয়েসন্তান হলে গর্ভপাতের হার এত বেড়ে যায় যে এই যন্ত্রকে ধ্বংস করে ফেলা হয় পৃথিবী থেকে। অনেক পুরোনো যন্ত্রাংশ থেকে এটা বানিয়েছেন চীনের বিজ্ঞানী নিংচ। বিজ্ঞানী নিংচের বানানো মেশিনে প্রতিনিয়ত পরীক্ষা করা হয়েছে সেই সন্তানকে।

দুপুর বারোটা সাত মিনিটে বানরীর প্রসব বেদনা ওঠে। বানর সন্তান অনেক ছোটখাটো হলেও এই মানব সন্তান কিছুটা বড় বলে বিজ্ঞানীরা মিলে সিজারের সিদ্ধান্ত নেন। বিজ্ঞানীদের মধ্যে আদিল এই গুরুদায়িত্ব নিজের হাতে নেন। অপারেশন টেবিলে বানরীকে অজ্ঞান করা হলো এবং তখন নিজের হাতে খুর দিয়ে বানরীর পেটের নিচ দিকের কিছু লোম তুলে স্কাল পেল দিয়ে চামড়া কেটেই অবাক হয়ে গেলেন আদিল। প্রচণ্ড শকে কাঁপা হাতে বাচ্চার নাড়ি কাঁচি দিয়ে কেটে তুলে নিলেন তিনি। এর মধ্যেই সেই বানরী মারা গেল জটিল অপারেশনে রক্তক্ষয়ের ফলে। বাচ্চার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ড. আদিল। বাচ্চাটা অদ্ভুত আকৃতির। সবচেয়ে বিসাদৃশ্য হলো বাচ্চাটার মাথা। সবকিছু মানুষের মতো হলেও বাচ্চাটার মাথা ঠিক বানরের মতো। বাচ্চাটাকে লোপার দিকে তুলে ধরেন ড. আদিল। আর বাচ্চাটাকে দেখেই জ্ঞান হারান লোপা।

বিছানা থেকে ধড়ফড় করে উঠে পড়েন লোপা। চারদিকে ভালো করে তাকালেন তিনি। না, চারপাশে কিছু নেই। সব স্বাভাবিক। রাত পোহাতে অনেক বাকি। কিন্তু স্বপ্নটা দেখে অনেক ভয় পেয়ে ঘেমে গেছেন লোপা। সাইডটেবিলে রাখা কাচের গ্লাসটা নিয়ে ঢকঢক করে শেষ করে ফেললেন গ্লাসের সব পানি। তারপর তাঁর বেঢপভাবে উঁচু হয়ে থাকা পেটে পরম মমতায় হাত বুলালেন লোপা। দুই দিন পরেই তাঁর অপারেশন হবে। জন্ম হবে তাঁর প্রথম সন্তানের। এই সময় এ রকম দুঃস্বপ্ন দেখা স্বাভাবিক-বলেছিলেন চিকিৎসক। এটা ভেবেই আবার আগের মতো ঘুমিয়ে গেলেন লোপা আহসান- মৃত ড. আদিলের সন্তান যাঁর উদরে বেড়ে উঠছে।

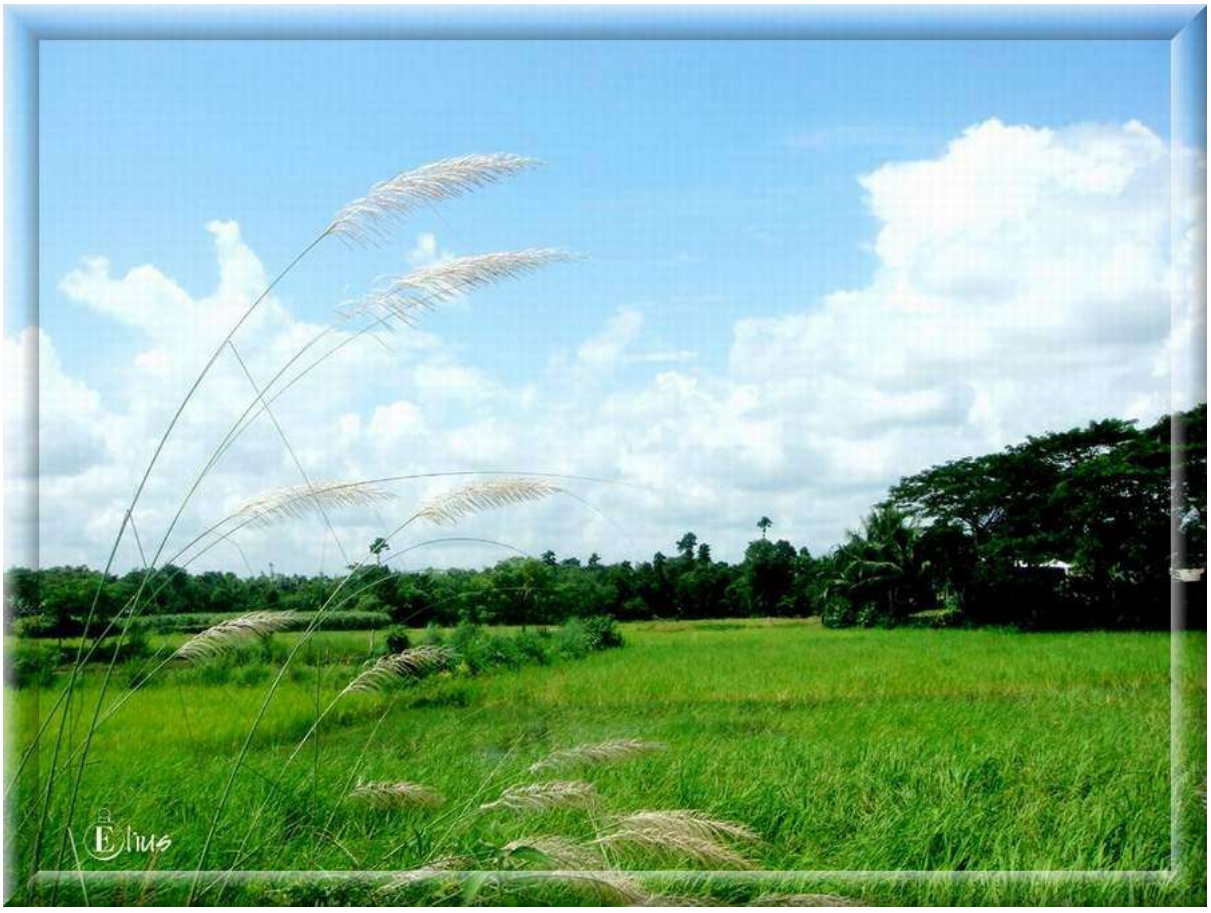

শরৎ
আলোকচিত্র: মোহাম্মাদ ইলিয়াস চৌধুরী

ঈদ মানে কী, খুব জানতে ইচ্ছে হয়!

মাহবুব আশরাফী

এখন রাত ১২টা, আমি হাঁটছি রাস্তার পাশে ফুটপাত ধরে। আর কিছু ঘণ্টা বাদেই সারা দেশ আনন্দে হাসবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নতুন কাপড়চোপড় পরে ঈদগাহ বা মসজিদে দৌড়াবে। বাবা-মায়ের হাত ধরে। ভাবতেই কত আনন্দ লাগে তাই না?

এখন রাত ১২টা ৩০। আমি এখনো হাঁটছি রাস্তার পাশে ফুটপাত ধরে আর কিছু ঘণ্টা বাদেই সারা দেশ আনন্দে হাসবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নতুন কাপড়চোপড় পরে ঈদগাহ বা মসজিদে দৌড়াবে বাবা-মায়ের হাত ধরে, কিন্তু দেশের অন্তত একজন ছেলে একজন বাবা একজন মা তার সন্তানকে নতুন জামা কিনে দিতে পারেনি। সেই ছেলে বা মেয়ে নতুন কিছু পড়বে না। বাবার হাত ধরে ঠিকই হয়তো নামাজে যাবে। কারণ? কারণ সেই পরিবারটি আমার সামনে ফুটপাতে শুয়ে আছে। ছোট্ট মেয়েটা চিৎকার করে কাঁদছে ভাবতে কি খুব আনন্দ লাগে?

এখন রাত একটা বাজে। আরও একটু এগিয়ে দেখলাম, আরও তিনটি পরিবারের কাছে ঈদ মানে শুধু দুটি বর্ণের একটি শব্দ আর প্রিয়জনকে খুশি করতে না পারার জ্বালা বাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া কিছুই নয়।

ঈদ! আরও একটু এগোলাম। এখন বাজে রাত দেড়টা। দেখলাম কিছু মানুষের জটলা। দূরে শুনলাম টায়ারের তীব্র আর্তনাদ। ভিড় ঠেলে কালো রঙের তরল একটা পদার্থ গড়িয়ে আসছে। একটা কুকুর সেই তরল পদার্থটা চেটে খাচ্ছে। আরও কাছে গিয়ে দেখলাম, তরুণ ছেলেটার নিথর দেহ। আর ওই তরলটা সোডিয়ামের লাইটে কাল হয়ে যাওয়া রক্ত। বুঝতে পারলাম, ঈদের আনন্দের মানে আরেকটা পরিবারের কাছ থেকে কমে গেল। আরও একজন বাবা, মা, ভাই, বোন হয়তো কিছু বন্ধুর কাছে সকালের ঈদের কোনো মানেই আর রইল না। ঈদ ওদের কাছেও দুটি বর্ণের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু সেই ড্রাইভার? যে এই তারুণ্যে ভরা এই প্রাণটা কেড়ে নিল তার কাছে ঈদ কী? খুব জানতে ইচ্ছা হয়।

জানার সেই ইচ্ছা নিয়ে আরও সামনে এগিয়ে গেলাম। এখন রাত দুইটা বাজে। সোডিয়ামের আলোতে রাস্তার ওপর টায়ারের গাঢ় দাগ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আরেকটি এগিয়ে যা দেখলাম তা নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হওয়ার কথা। কিন্তু আমি কিছুই অনুভব করলাম না। বুঝতে পারলাম ঈদ নামের শব্দটা আরও অনেক মানুষের জীবন থেকে চলে গেল। সেই সঙ্গে তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত শত শত হৃদয় সকালে আনন্দের বদলে দুমড়ে-মুচড়ে যাবে। কেউ কেউ হয়তো জানবেই না তার প্রিয় জন কোথায়।

কিন্তু আমি নির্বাক তাকিয়ে আছি। কোনো অনুভবই হচ্ছে না। আমার কি এখন মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার কথা? নাকি দৌড়ে যাওয়ার কথা? কী করা উচিত আমার?

একটি বাস আরেকটি টেম্পো মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। বাসটি উল্টে একটি গাছের সঙ্গে আটকে গেছে। না হলে হয়তো গড়িয়ে নিচের খাদেই পড়ে যেত। টেম্পোটি দুমড়েমুচড়ে গেছে। বাসের কাছে গিয়ে দেখলাম, বাসের জানালা দিয়ে দুটি ঝুলে থাকা হাত জানিয়ে দিচ্ছে, ভেতরে বেঁচে থাকা মানুষের সংখ্যা হয়তো খুবই কম। তার মাঝ থেকেই আহত মানুষের চিৎকার ভেসে আসছে। একজন জানালা দিয়ে গড়িয়ে মাটিতে পড়ল। হাঁটু গেড়ে বসে আমার টি শার্টটি আঁকড়ে ধরল। যেন কোনো অবলম্বন চাচ্ছে। একটি হাত তুলে আমাকে ডাকছে। সাহায্যের করুণ আকুতি করে যাচ্ছে। কিন্তু আমার হৃদয়ে এতটুকু সাড়া দিল না। আমি সামনে এগোলাম।

এখন রাত তিনটা। আমি বসে আছি। আর কিছু ঘণ্টা বাদেই সারা দেশ আনন্দে হাসবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নতুন কাপড়চোপড় পরে ঈদগাহ বা মসজিদে। দৌড়াবে বাবা-মায়ের হাত ধরে। ভাবতেই কত আনন্দ লাগে, তাই না?

এখন সকাল নয়টা। আমি ঈদের নামাজ পড়তে যাইনি। ঘুমাচ্ছিলাম। বাবা এসে আমাকে রীতিমতো ভর্ৎসনা করলেন ঈদের নামাজ না পড়ার জন্য। আমার টি শার্টে রক্ত দেখে জিজ্ঞেস করলে আমি বাবাকে বললাম, আমি একজন মৃতপ্রায় মানুষকে কাল বাঁচাতে পারতাম, বাঁচাইনি। তিনি আমার দিকে চুপ করে তাকালেন। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, তুই কি ডাক্তার? খুব পণ্ডিতি করিস, না? বাঁচাতে পারতাম। কই দেখে যাও তোমার ছেলের কথা শুনে যাও। সে নেতা হয়েছে। সে জনসেবা করতে যায়। বাবা বললেন, জলদি রেডি হয়ে নে। প্রেসিডেন্টের বাসভবনে যাব। দেরি যাতে না হয় বলে হনহনিয়ে চলে গেলেন।

আমি একটু হাসলাম। এখন সকাল নয়টা ২৫। সারা দেশ আনন্দে হাসেনি। দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নতুন কাপড়চোপড় পরে ঈদগাহ বা মসজিদে যায়নি বাবার হাত ধরে। কারণ, তার বাবা অথবা মা অথবা আপনজন রাস্তায় এখনো হয়তো নিথর হয়ে পড়ে আছে। পরিবারটি হয়তো খবরও পায়নি। দেশের মোট জনসংখ্যার অন্তত অর্ধেক মানুষ নতুন জামাকাপড় পরে ঈদগাহে যেতে পারবে না। অনেক মানুষ আজ এই দিনেও দুই বেলারও কম না খেয়ে থাকবে।

প্রিয়জনহারা মানুষগুলোর কাছে আজ ঈদ মানে দুটি শব্দ বাদে কিছুই না। ঈদ শুধু দুটি বর্ণ। অন্তত আমার কাছে ঈদ দুটি বর্ণ বাদে আর কিছু না। খুব জানতে ইচ্ছা হয়, আপনাদের কাছে ঈদ মানে কী?

এখন বেলা ১১টা। আমি প্রেসিডেন্টের বাসভবনের লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। আজ মহা আনন্দের দিন। এখানে সবাই হাসছে। একজনের সঙ্গে আরেকজন হাত মেলাচ্ছে। কোলাকুলি করছে। আমি এর কোনোটাই করতে পারছি না। সরি। কারণ, ঈদ মানে আমার কাছে দুটি বর্ণ খুব জানতে ইচ্ছে হয় আপনাদের কাছে ঈদ মানে কি অনেক আনন্দের তাই না?

একটি আংটি এবং...

রুদ্র মিজান

স্বর্ণের দোকানে প্রচণ্ড ব্যস্ততা। উচ্চবিত্ত সুন্দরী রমণীদের বেশ উপস্থিতি। এরই মধ্যে কীভাবে দোকানের ভেতরে যাবে গুলবাহার। হাতে ভিক্ষার ঝুলি, ময়লা কাপড় পরা এই বৃদ্ধাকে দেখেই হয়তো চেঁচিয়ে উঠবেন জুয়েলার্সের মালিক অন্নদা বণিক। কিন্তু আজ তাঁকে যেতেই হবে।

ক্ষুধায় পেটটা ছমছম করছে। গত রাত থেকে আজ দুপুর পর্যন্ত তাঁর খাওয়া হয়নি। এই শহরে ভিক্ষুকের সংখ্যা প্রচুর হলেও খাওয়া-দাওয়ার সমস্যা হয় না। সারা দিনে কমবেশি যা জোটে তা খারাপ না। কিন্তু গুলবাহারের সমস্যাটা অন্য রকম। বারবার গুলবাহারের চোখে ভেসে উঠছে তাঁর মেজ মেয়ের মুখ। যেন শ্রাবণের আকাশ। কালো মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে। অথচ মেয়েটা কত সুশ্রী। এখন চোখের জলই তাঁর সঙ্গী। মেয়ের জামাই কৃষক। এবার ফসল ভালো হয়নি। খরায় নষ্ট হয়ে গেছে। ব্যবসা করতে চায় সে। শাশুড়ি একা মানুষ। ভিটেমাটির কী দরকার। তাই ভিটেমাটি বিক্রি করে ব্যবসার জন্য টাকা নিতে চায় জামাই। গুলবাহারের মেয়ে সেলিনা এক কথায় অসম্মতি জানিয়েছে। বলেছে, এটা কোনো দিনও হবে না।

এ জন্য জামাই খুব ক্ষিপ্ত। কারণে-অকারণে বেদম প্রহার করে সেলিনাকে। কিন্তু গুলবাহারকে তা জানায়নি সেলিনা। মেয়েজামাইয়ের বাড়ির প্রতিবেশীরাই এ খবর জানিয়েছে তাঁকে। খবরটি পাওয়ার পর থেকে গুলবাহারের মুখ দিয়ে কোনো খাবার যাচ্ছে না। যে মেয়েকে কোনোদিন মারধর করেনি গুলবাহার আর তাঁর স্বামী রমিজ আলী, সেই মেয়েকে পেটাচ্ছে অন্য বাপের পুত। এটি কী করে সহ্য করবে গুলবাহার। গুলবাহারের স্বামী রমিজ আলী বেঁচে নেই। রমিজ আলী বেঁচে থাকলে কী এটি সহ্য করতে পারতেন? তাই গুলবাহার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁর স্বর্ণের আংটিটি বিক্রি করে যে টাকা পাবেন, তা মেয়ের জামাইকে দিয়ে দেবেন। তাতেও যদি মেয়ের জামাই খুশি না হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত ভিটেটা বিক্রি করতে হবে। তবে এ বিষয়টি গুলবাহারের অন্য মেয়েরা কীভাবে নেবে, তা একবারের জন্যও তাঁর মাথায় আসেনি। গুলবাহারের তিন কন্যা। এর মধ্যে সেলিনা হচ্ছে মেজ।

যা-ই হোক আপাতত আংটিটা বিক্রি করতে হবে। এর আগে অনেকবার এ আংটিটি সে বিক্রি করতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। আংটির মাঝে অদৃশ্য এক ক্ষমতা রয়েছে। যে কারণে সে চাইলেই তা বিক্রি করতে পারে না। এই আংটির মাঝে একটি জীবন খুঁজে পান গুলবাহার। বিক্রি করতে চাইলেই এ জীবন কাঁদে। প্রতিবাদ করে। কিছুতেই গুলবাহারের হাতছাড়া হতে চায় না এটি। অনেকবার স্বর্ণের দোকানে আংটি ওজন করে দরদাম প্রায় ঠিক করার পরও তা বিক্রি করেনি গুলবাহার।

অবশ্য এ আংটির কারণে এ পর্যন্ত অনেক ঝামেলাও পোহাতে হয়েছে তাঁকে।

এই তো সেদিন মহল্লার এক বাসায় ভিক্ষা করার পরে বাসার এক রমণী তাঁকে খেতে দিলেন। তখন দুপুর বেলা। বাসার কর্তাবাবু সবে দুপুরের খাবারের জন্য বাসায় এসেছেন। গুলবাহার বাসার সদর দরজার একপাশে ইটের ওপর বসে ভাত খাচ্ছিলেন। মাংসের তরকারি আর ভাত একসঙ্গে, একই প্লেটে দেওয়া হয়েছে তাঁকে। অনেক দিন পর মাংস দেখে জিবে জল আসে গুলবাহারের। খুশিতে আলতো একটা মিষ্টি হাসির আভা তাঁর চোখে-মুখে ফুটে ওঠে। খাবার প্রায় শেষ পর্যায়ে ঠিক তখন একটা অন্য রকম গন্ধ পায় সে। গন্ধটা কোত্থেকে আসে। তা বুঝতে বেশ সময় লাগেনি। গুলবাহার বুঝতে পারে বাসি মাংসের তরকারি দিয়ে তাঁকে খাওয়ানো হয়েছে।
এটি অবশ্য নতুন কিছু নয়। প্রায়ই এ রকম ঘটে। অভ্যস্ত হয়ে গেছে এসব। প্রথম প্রথম বমি বমি ভাব করত। এখন আর তা করে না। এখন একদম খাঁটি ভিক্ষুক সে। ভিক্ষুকদের আবার পচা-বাসি কী, যা পাবে তাই খাবে। একটু জোরে শব্দ করে 'শুকুর আলহামদুলিল্লাহ' বলে প্লেটটি ধুয়ে দেয় সে। ঘরের বাইরের ট্যাপ ছেড়ে পানি দিয়ে প্লেট ধোয়ার সময় তাঁর ঝুলি থেকে পড়ে যায় আংটিটি। একটা শব্দ হলো। গুলবাহার বুঝতে পারলেন এটি তাঁর আংটি পড়ার শব্দ। কিন্তু কোথায় পড়ল, চোখে পড়ছে না। তাঁর দু'চোখ বেশ দ্রুতগতিতে খোঁজে। বিষয়টি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাসার কর্তার দৃষ্টি এড়াতে পারে না।

এই বুড়ি কি খোঁজো?
আংডি।
চমকে ওঠেন কর্তা। আংটি! কিসের আংটি, কার আংটি?
স্বর্ণের আংডি। আমার আংডি।
বেশ চটে যান কর্তা। দ্রুত ছুটে যান। দেখি কোথায়...
এনো পড়ছে।
এদিক-ওদিক দৃষ্টি মেলে তাকান কর্তা। তারপর গুলবাহারের দিকে। সন্দেহমূলক দৃষ্টিতে তাকান তিনি। বলেন, তুমি এটি কোথায় পেলে?

ততক্ষণে গুলবাহার ড্রেনের এপাশে পড়ে থাকা তাঁর আংটিটি হাতে নিতে নিতে বলেন, এইডা আমার স্বামীর দেওয়া আংডি।

গুলবাহারের কথা শুনে মুখের ভাষা বদলে যায় কর্তার। বললেন, স্বামীর দেওয়া আংটি... না? সত্যি কথা বল, এটি কোত্থেকে চুরি করেছিস?

কথা শুনে চেঁচিয়ে ওঠেন গুলবাহার। ফহির দেখলেই কী চোর মনে অয়। আমরা গরিব মানুষ। ভিক্ষা কইরা খাই, চুরি করি না।

এ রকম কথাগুলো এই শ্রেণীর লোকদের একদম মুখস্থ কথা, বাসার কর্তা তা ভালো করেই বোঝেন। তিনি বললেন, দাঁড়া তোকে পুলিশে দেব। তখন ঠিকই বলবি কোত্থেকে চুরি করেছিস।

স্বামীর চিৎকার আর ভিক্ষুক মহিলার কান্নার শব্দ শুনে বাইরে যান ওই কর্তার স্ত্রী। নির্বাক তাকিয়ে থাকেন তিনি। বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করেন। তাৎক্ষণিকভাবে গুলবাহার তাঁকে আম্মা আম্মা বলে নালিশ করেন।

স্বামীকে থামিয়ে দেন তিনি। বলেন, থামো তো তুমি। স্বর্ণের আংটি ওর থাকতেই পারে। মানুষ কি ভিক্ষুক হয়ে জন্মায় নাকি? গুলবাহারকে তিনি যেতে বলেন।

ওই দিন রাতে গুলবাহার বেশ কেঁদেছেন। খেয়ে না খেয়ে আংটিটি রেখেছেন। আর সেই আংটির জন্য আজ তাঁকে চোর বলে সন্দেহ করা হলো। এসব ভাবতে ভাবতে রাত বেশ গভীর হয়। শেষ রাতে ঘুম আসে গুলবাহারের। পরদিন সকালেই মনস্থির করেন, আংটিটি বিক্রি করে দেবেন।

আংটি বিক্রির সিদ্ধান্তের পর থেকেই বিমর্ষ হয়ে গেছেন গুলবাহার। যেন প্রাণহীন দেহ। আংটির ওপর দৃষ্টি পড়লেই চোখে জল টলমল করে। এই আংটিটি যেন নীরবে গুলবাহারের সঙ্গে কথা বলে। তাঁকে আবেগতাড়িত করে। সিদ্ধান্ত অনুসারে যথারীতি একটি জুয়েলার্সের দোকানে যান তিনি। কিন্তু বিক্রি করা হয় না। আংটির এক অদৃশ্য ক্ষমতার কাছে হার মানে পেটের ক্ষুধা আর মিথ্যা অপবাদ।

কিন্তু এভাবে বেশিদিন যায়নি। সেলিনার নির্যাতিত মুখ। মেয়ের জামাইয়ের বেদম প্রহারের খবর শুনে আংটিটি বিক্রি করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন তিনি। দ্রুত ছুটে যান অন্নদা বণিকের স্বর্ণের দোকানে। অভিজাত জুয়েলার্সে সুশ্রী রমণীদের ভিড়ে তাঁকে ভীষণ বেমানান লাগছিল। তার পরও এগিয়ে যান। আজ এটি বিক্রি করতেই হবে। চোখে ভাসে সেলিনার করুণ মুখ। আবার কখনো প্রিয়তম রমিজের মুখ।

অন্নদা প্রথমেই জানতে চাইলেন, কোথায় পেয়েছেন এটি?

থমকে যান তিনি। এ আবার কেমন কথা। কত মানুষই তো এ রকম কত স্বর্ণ-গহনা বিক্রি করে, তাঁদের কি এভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়? সবই কপাল! অকালে স্বামী মারা না গেলে তাঁর কি এই অবস্থা হতো। স্বামীর রোজগার তো ভালোই ছিল। বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল তাদের পরিবার। যা-ই হোক দোকানিকে বললেন, এইডা অনেক দিন আগে আমার এক বিদেশি ভাইয়ে দিছিল।

অন্নদা মাথা ঝাঁকিয়ে আংটিটি মাপতে মাপতে বললেন, দাম বেশি পাবে না। এইটায় স্বর্ণ বেশি নাই। দাম সাত হাজার টাকা।

অনেক টাকা। গুলবাহার ভেবেছিলেন কত আর হবে, চার বা পাঁচ হাজার। কিন্তু আংটিটি বিক্রি করা হয়নি। রমিজের মায়া মায়ামুখ তাঁকে সিদ্ধান্তহীনতায় পৌঁছে দেয়। তখন কেন যেন বুকটা তাঁর খালি খালি লাগছিল। মনকে সান্ত্বনা দিতে ব্যর্থ হলেন গুলবাহার। তিনি বাড়ি ফিরে যান।

আংটির দিকে তাকালেই গুলবাহারের প্রিয়তম রমিজের কথা মনে আসে। গুলবাহারকে ভীষণ ভালোবাসতেন রমিজ। একটি সিকিউরিটি কোম্পানিতে প্রহরী হিসেবে কাজ করতেন তিনি। মাস শেষ হলেই চকচকে নতুন নোট। চার হাজার টাকা। বেশ ভালোভাবেই চলছিল তাঁদের জীবন। তিন কন্যার কত আবদার মেটাতে হতো রমিজকে। রমিজের সব স্যাররাই 'ম্যারেজ ডে' পালন করেন। এ রকম দু'একটি অনুষ্ঠানে দাওয়াত পেয়ে অফিসের স্টাফদের সঙ্গে তিনিও গিয়েছিলেন। কী মধুর দৃশ্য! স্বামী-স্ত্রীকে এবং স্ত্রী-স্বামীকে কেক মুখে তুলে খাওয়ান। সঙ্গে প্রিয় মানুষেরাও। সবার সঙ্গে রমিজও সেদিন করতালি দিয়েছিলেন। ভীষণ মজার।

এসব অনুষ্ঠানে রমিজের স্যাররা তাঁদের স্ত্রীদের দামি দামি গিফট প্রদান করেন। রমিজ তা দেখেন আর ভাবেন সব শখ, সব সুখ, সব স্বপ্ন যেন বড়লোকদের জন্য। রমিজ এ সুখ থেকে তাঁর বউকে বঞ্চিত করতে চান না। তাই ঈদ উপলক্ষে স্যারদের বকশিশ নিয়ে গুলবাহারের জন্য একটি স্বর্ণের আংটি কেনেন রমিজ। রমিজের বিয়ের তারিখটা মনে নেই। গরিব মানুষের জন্ম, বিয়ের তারিখ সাধারণত মনে থাকে না। পেটের জ্বালায় সব ভুলে যান তাঁরা। তবে রমিজের এতটুকু মনে আছে, শ্রাবণ মাসের এক শুক্রবারে বিয়ে হয়েছিল রমিজ ও গুলবাহারের। গ্রামের এক মসজিদে কয়েকজন লোকের সামনে ইসলাম ধর্মের নিয়মে বিয়ে হয়েছিল তাঁদের।

ভেবে ভেবে মাথার চুল না টেনে শ্রাবণ মাসের এক শুক্রবারের রাতে গুলবাহারকে ওই আংটিটি গিফট করেন রমিজ। আহ! সে রাতে কী আনন্দ। গুলবাহার তো খুশিতে টলমল। মায়া মায়া হাসি দিয়ে বলেছিলেন, এত ট্যাকা তুমি খরচ করলা!

রমিজ বলেছিলেন, হুঁ করলাম। আমার সোনাবউয়ের লাইগা করুম না তো কার লাইগা করুম। এইডা অইলো আমার ভালোবাসার একটা চিহ্নমাত্র। পারলে তো তোমারে আর কত কিছুই দিতাম।

গুলবাহার মিটি মিটি হাসেন।

এ হাসি আর বেশিদিন স্থায়ী হয়নি গুলবাহারের। হঠাৎ একদিন মাঝরাতে দরজায় নক করেন রমিজের সহকর্মী রহিম। কী হইছে? জানতে চান গুলবাহার। রমিজের বুকে প্রচণ্ড ব্যথা। এক্ষুনি ডাক্তারের কাছে নিতে হবে।

বুকটা কেঁপে ওঠে গুলবাহারের। বড় মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত পা বাড়ান। না। শেষ রক্ষা হয়নি। পথিমধ্যেই প্রচণ্ড ব্যথায় রমিজ চলে যান না ফেরার দেশে। আকাশ-বাতাস যেন তখন স্তব্ধ গুলবাহারের কান্নায়।

এসবই এখন স্মৃতি। সূর্য তখন মাথার ওপর তা দিচ্ছে। গুলবাহার আজ ভিক্ষে করতে যাননি। মনটা ভালো নেই। আংটির জন্য। যে মেয়ের সুখের জন্য আংটি বিক্রি করবেন, তার জন্যও বুকের ভেতর চাপা একটা কষ্ট অনুভব করছেন গুলবাহার। মনে হচ্ছে, তাঁর মেয়ের কোনো বিপদ। এরই মধ্যে বাইরে থেকে পাশের বাড়ির মধু ডাকে... কী গো বুড়ি বাইতে আছো নি?

বাঁশ দিয়ে আটকানো টিনের দরজা খুলতে খুলতে গুলবাহার জানতে চান, কী রে মধু ডাকলি ক্যা?

মধুর মুখে খবরটা শুনে থমকে যান গুলবাহার। না। তিনি কাঁদেন না। স্থির দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর চোখে ভাসে সেলিনাকে পেটাচ্ছে তার স্বামী। সে ব্যবসা করবে। তাই গুলবাহারের বসতভিটে বিক্রি করে টাকা নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিল। সেলিনা অসম্মতি জানায়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই বাগবিতণ্ডার একপর্যায়ে সেলিনাকে বেদম প্রহার করেছিলেন তাঁর স্বামী। সেলিনা এখন হাসপাতালে। হঠাৎ যেন ভূকম্পের মতো পৃথিবী কাঁপান গুলবাহার।

মাইয়ারে, তুর সুখের লাইগা জান কুরবান দিয়াম। তুর বাপের দেওয়া আংডি, এই বাড়ি সব বিক্রি কইরা দিয়াম...।

আমার স্ত্রী মা হয়েছে

বিন আরফান

এই তো সেদিনের কথা। সময়টা ছিল ২০০৬ সালের মার্চ মাসের দুই তারিখ। সেদিন বেশ ভাপসা গরম অনুভূত হচ্ছিল। আমার ঘরের ফ্যানটাও যেন তামাশা করছিল। ঘুরছিল ঠিকই, কিন্তু ফ্যানের যে কাজ অর্থাৎ শরীর ঠান্ডা করা, তা হচ্ছিল না। শুধু অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ হচ্ছিল। সান্ত্বনা বলতে ওইটুকুই। হঠাৎ গভীর রাতে বিদ্যুৎ উধাও। এ যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। শরীরে ঘাম জমে তা শীতের শিশির বিন্দুর মতো টলমল করছিল। ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল।

একটু হলেও এই অস্বস্তি থেকে বাঁচার জন্য হাতপাখার বাতাস নিচ্ছিলাম। আমার পাশে শুয়ে ছিল আমার স্ত্রী। মাঝে মধ্যে তার দিকেও পাখাটা ঘোরাচ্ছিলাম। ও হঠাৎ খেপে গেল, তুমি আসলেই পাষাণ। বাতাসটাও জোরে দিতে জানো না। বলেই স্ত্রী কান্না জুড়ে দিল।

তার এ রূপ আক্ষেপে অবশ্য আমার খারাপ লাগল না। আহারে বেচারা! নয় মাসের দ্ইু যমজ সন্তানকে গর্ভে নিয়ে ভাপসা গরমে ছটফট করছিল। আমিও গরমে হাঁপাচ্ছিলাম, কিন্তু স্ত্রীর ভেতরের অস্থিরতার বিন্দুমাত্রও যেন আমাকে স্পর্শ করতে পারছিল না। বরং ওর অস্থিরতা আমাকে ব্যাকুল করে তুলছিল। এর কারণ অবশ্য স্পষ্ট। আমাদের ছিল ভালোলাগা আর ভালোবাসার বিয়ে। তার ওপর আমি নিজে ওকে পছন্দ করেছিলাম।

এ রকম পরিস্থিতিতে আমি ওর মাথায় পরম মমতায় হাত বোলাতে বোলাতে প্রশ্ন করলাম, খুব খারাপ লাগছে?

ও কপট অভিমানের সুরে বলল, ধরবে না তুমি আমাকে। ঘুমাও। কেউ আমাকে বুঝতে চাও না। আমার কী যে যন্ত্রণা। আজ আমার মা যদি বেঁচে থাকত।

কথাগুলো বলে ও আবার কাঁদতে শুরু করে দিল।

নিজেকে আমার অসহায়ের মতো মনে হলো। অনেক তোষামোদ করে ওর কান্না থামালাম। কিন্তু ওর মাতৃত্বকালীন যে যন্ত্রণা, তা হয়তো আমি কিঞ্চিৎ পরিমাণও অনুভব করতে পারছিলাম না। বাসায় মহিলা বলতে আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ ছিল না। ওর মা মৃত, বোন নেই। আর আমরা নিজে নিজে বিয়ে করে আলাদা থাকার ফলে আমারও নিকট আত্নীয় বলতে কেউ কাছে ছিল না।

খুব চেষ্টা করছিলাম নিজেকে সামলে রাখতে। কিন্তু মানুষ তো। তাই ওর অস্থিরতা আর চেঁচামেচি মাঝেমধ্যে আমার প্রচণ্ড বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। আসলে ও চাইছিল আমাকে অবলম্বন করে একটু ভালো লাগার পরশ পেতে। একটু নির্ভরতা পেতে। কিন্তু আমার এলোমেলো মন পরিস্থিতিটা সামাল দেওয়ার মতো যথেষ্ট পরিপক্ব ছিল না। বরং ধৈর্যের সীমা ভেঙে মনে হচ্ছিল, একটু ধমক দিই ওকে, এবার একটু থামো প্লিজ। কাল আমার অফিস আছে।

কিন্তু মনের কথা মনেই রয়ে গেল। এতটা নিষ্ঠুর আমি কখনোই হয়তো হতে পারব না। তাই কথাগুলোও আর বলা হলো না। তা ছাড়া আমি ছাড়া ওর যে আর কেউ নেই। আর যন্ত্রণাটা তো ওরই বেশি। অন্তত এটা ভেবেই আমি ক্ষান্ত হলাম। দু'এক কলম লেখাপড়া শিখেছিলাম বলে মনে পড়ল সেই ছোটবেলায় শেখা কবিতার অংশবিশেষ, 'চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন, ব্যথিত ব্যথা বুঝিতে কি পারে....”

স্ত্রীর প্রতি সৃষ্টিকর্তার অপার কৃপা আর রহমত ছিল। যেহেতু আমি ছাড়া ওর আর আপন বলতে কেউ ছিল না, তাই ওর ব্যথার মর্মটা আমাকে কিঞ্চিৎ বোঝানোর জন্যই হয়তো আমার হাঁটুর ওপরের মাংসপেশিতে একটি ফোঁড়া হলো। আমি না বুঝে চুলকিয়ে অবস্থা আরও ভয়াবহ করে ফেললাম। অসহ্য ব্যথায় চিৎ হয়ে শুতে পারতাম না। ব্যথার তীব্রতায় কান্না পেলেও নিজেকে সামলে রাখতাম। স্ত্রী কোথা থেকে যেন ঔষধি গাছের পাতা সংগ্রহ করে তা পাটায় বেটে এক রকমের ওষুধ বিকেলেই বানিয়ে রেখেছিল। এখন আমি ব্যথা অনুভব করছি। আমার নড়াচড়ার ধরনে আমি ব্যথিত সে উপলব্ধি করে সেই বাটা ওষুধ আমার ক্ষতস্থানের চারপাশে লেপ্টে দিল। তাতে আমি আরাম অনুভব করতে লাগলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার ব্যথা বুঝি এর চেয়েও বেশি?

ও আমার প্রশ্ন শুনে উচ্চস্বরে কান্নায় ভেঙে পড়ল। কান্নাজড়িত কণ্ঠেই বলল, না আমার কিসের ব্যথা। তুমি তো আমার পাশেই আছ।

কথাগুলো বলতে বলতে ও আমার বুকে মাথা রাখল। আমিও ওর মাথায় পরম মমতায় আলতো হাত বুলাচ্ছিলাম। হঠাৎ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ও 'আল্লারে' বলে ভীষণ ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি হতভম্ব। মনে হচ্ছিল, আমার বুকের সবকটি হাড় ভেঙে এক জায়গায় জড়ো হয়ে গেল। আমার চোখ দিয়ে পানি নয়, যেন রক্ত ঝরে পড়বে। ওর কি হলো আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে পাশের বাড়ি থেকে একজন ছুটে এলো। দুজনে ধরে তাৎক্ষণিক আবাসিক হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। আরএমও দ্রুত অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে সিএমএইচ রেফার করে দিল। আমি দিশেহারা হয়ে পড়লাম। সঙ্গে কী নেই, কী আছে, কী করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। সেই দিনই প্রথম উপলব্ধি করতে পারলাম, এই বিশাল পৃথিবীতে আমি আসলে খুবই একা।

অ্যাম্বুলেন্সের বেডে শুয়ে থেকে স্ত্রী আমার কাছে জানতে চাইল, আমি যদি মরে যাই, তোমাকে কে দেখবে?

তার এমন কথায় আমার বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। অবাক হলাম, যাঁর নিজের অবস্থা এতটা সঙ্গিন, সে কি না আমাকে নিয়ে চিন্তিত। কতটা ভালোবাসা থাকলে এমন প্রশ্ন করা যায়?

চোখে আমার জল টলমল করছিল। বুকের ভেতর যেন একটি বিশাল কষ্টের পাথর জায়গা করে নিল। যে পাথর কাউকে দেখানো যায় না, আবার বয়ে বেড়ানোও যায় না। আমি সেই কষ্টের কথা তাকে বলতে পারলাম না। কিছু কিছু কষ্ট আসলে কাউকে দেখাতে নেই। শুধু নীরবে চোখের জল ফেলতে লাগলাম। তা ছাড়া মনে সংশয় ছিল ও যদি সাহস হারিয়ে ফেলে?

আমি ওকে সাহস দেওয়ার জন্য বললাম, তোমার কিছুই হবে না। তুমি মা হবে। আমাদের ঘর আলোকিত হবে। দেখ, তখন আর আমরা একা থাকব না। সন্তানের কলকাকলিতে ঘরটা কানায় কানায় পূর্ণ হবে।

স্ত্রী কিছুটা আহত স্বরে জানতে চাইল, আমি কি মা ডাক শুনতে পারব? মনে হয় আমি আর বাঁচব না।

ওর কথার উত্তর দিতে না দিতেই অ্যাম্বুলেন্স সিএমএইচের গেটে চলে এল। একজন স্পেশালিস্ট গাড়ির সামনে চলে এলেন। সিস্টারকে দ্রুত সিজারের ব্যবস্থা করতে বলে আমাকে বললেন রক্ত সংগ্রহ করতে। তারপর তারা আমার স্ত্রীকে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় ও আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে অসহায়ের মতো তাকিয়ে রইল। আমার ভেতর তখন কী থেকে কী হয়ে গেল জানি না। ও আমার চোখের আড়াল হওয়ার পরেই নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। এতক্ষণের জমানো মেঘ যেন এবার শ্রাবণ ধারায় বর্ষণ হতে লাগল। হু হু করে কেঁদে উঠলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর মনটা একটু হালকা হলো।

রক্তের প্রয়োজনের কথা আমি ফোন করে আমার অফিসে জানিয়ে দিলাম। বাড়িতে কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। কারণ আমি বিয়ের পর থেকেই কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখিনি। অন্য কোনো কারণে নয়, লজ্জায়। কিন্তু সেদিনের সেই পরিস্থিতিতে সব যেন ভুলে গেলাম। মাকে ফোন করে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললাম, মা আজ লিপির (আমার স্ত্রীর নাম) সিজার হবে। রক্ত লাগবে। যমজ ছেলে, জানি না বাঁচবে কি না।

কথাগুলো বলেই ফোন রেখে দিলাম। নিজেকে উদ্ভ্রান্তের মতো লাগছিল। ঘণ্টা খানেক একের পর এক সিগারেট টানতে লাগলাম। বিবাহিত জীবনের সুখের ছোট ছোট অনেক স্মৃতি এলোমেলোভাবে মনে এসে ভিড় করতে লাগল। একজন পুরুষের জীবনে তার স্ত্রী যে কত গুরুত্ব বহন করে, তা বুঝতে পারছিলাম। এরই মধ্যে অফিসের তিনজন সহকর্মী এসে জানাল, রক্ত জমা দিয়ে এসেছি। চিন্তা করো না। সিজার হবে।

শুনে সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে উঠল। আসলে সেনাবাহিনীতে ‘সকলের তরে সকলে মোরা, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে’ সর্বদা এই নীতি প্রচলিত। চাওয়া মাত্রই সব যেন মুহূর্তের মধ্যেই মিলে যায়।

আমাকে অবাক করে দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসপাতালে আমার মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন সবাই চলে এল। মা জানতে চাইল, আমার বৌমা কোথায়? আমি রক্ত দিয়ে এসেছি।

মায়ের মুখে এমন কথা শুনে ভালো লাগায় আমার চোখ দুইটা যেন আবার ভিজে উঠল।
সিজারের প্রস্তুতি সম্পন্ন। শেষবারের মতো আমি স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। আমি ওকে আর কি সান্ত্বনা দেব, উল্টো ও আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, চিন্তা করো না। সব সময় নিজের দিকে খেয়াল রেখ। আর আমার সন্তানদের দেখো। জানি, তোমার কষ্ট হবে। তবু চেষ্টা করো ওদের মানুষ করতে।

আমি কিছু বলতে চাইলাম। কিন্তু পারলাম না। ডাক্তারের অনুরোধে আমাকে বাইরে যেতে হলো।

এরপর শুরু হলো প্রতীক্ষার এক দীর্ঘ প্রহর। ওয়েটিংরুমে সবাই অস্থির। আমার ভেতরে যেন ভাংচুর শুরু হয়ে গেল। জীবনের সব নেক কাজের কথা ভাবতে লাগলাম। শুধু বিনিময়ে স্ত্রীর জন্য পানাহ চাইলাম। হঠাৎ ভেতরে কামড় দিয়ে উঠল। সাদা গ্লাসে নির্মিত দেয়াল দ্বারা ওটি থেকে ডাক্তারকে বেরিয়ে আসতে দেখি। দেয়ালটি শব্দ প্র“ফ বিধায় নবজাতকের কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম না। মনে ভয় ঢুকে গেল। আমি কি সব হারালাম? এমনি সময় চিরকাঙ্ক্ষিত সেই খবরটি পেলাম। আমার স্ত্রী মা হয়েছে! নার্সরা ওটি থেকে দুটি চাঁদের মতো ছেলে বের করে নিয়ে এল। আমার মা ওদের কোলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, আমি দাদি হয়েছি।
আমি দৌড়ে স্ত্রীর কাছে গেলাম। ওর তখন জ্ঞান ছিল না। ডাক্তার বললেন, সুস্থ আছে। শব্দ করবেন না। বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন।
আমার মন মানছিল না। তাই শব্দ না করার ওয়াদা করে ডাক্তারকে অনুরোধ করে আমি ওর পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওর যখন জ্ঞান ফিরল, তখন যেন আমি প্রাণ ফিরে পেলাম। কিন্তু ও কোনো কথা বলতে পারছিল না। আমাকে ইশারায় বোঝাতে চাইল, তুমি বাবা হয়েছ।
আমি বললাম, না, তুমি মা হয়েছ।
ও আমার কথায় মুচকি হাসল। সেই হাসি এতটাই ভালো লাগার আর এতটাই নির্মল ছিল যে, তৎক্ষণাৎ আমার মনে হলো, পৃথিবীতে এর চেয়ে সুখের অনুভূতি আর কিছুতেই হতে পারে না। কিছুতেই না।

স্মৃতিচারণা

দুই রাজাকারের শাস্তি

নাসির আহমেদ কাবুল

রাজাকার, আলবদর ও আলশামসদের পশুর সঙ্গে তুলনা করলে ওই জন্তুগুলোর প্রতি অবিচার করা হবে। কোনো পশুই অন্য একটি পশুকে ধর্ষণ করে না, হত্যা কিংবা তার শান্তি বিনষ্ট করে না। অথচ '৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষকে বিনা কারণে হত্যা করেছে, ধর্ষণ করেছে। শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধারা পর্যন্ত ওদের লালসার শিকার হয়েছে। ওরা মানুষের সাজানো সংসার লুটপাট শেষে আগুন লাগিয়ে উল্লাস করেছে। এ কারণে ওদের পশুর সঙ্গে তুলনা করা চলে না। রাজাকাররা পশুর চেয়েও অধম। ওদের পশুর সঙ্গে তুলনা করলে পশুদের অপমান করা হয়।

স্বাধীনতাযুদ্ধে ৩০ লাখ লোক শহীদ হয়েছে। দুই লাখ মা-বোনকে ধর্ষণ করা হয়েছে। কত সাজানো সংসার আগুনে পুড়ে ছারখার হয়েছে সে হিসাব আমাদের জানা নেই। নারকীয় এই হত্যাযজ্ঞ ও মানবতাবিরোধী অপরাধে হানাদার বাহিনীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছে তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনী। এই তিনটি বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষস্থানীয় নেতারা। গোলাম আযম, মতিউর রহমান নিজামী, আবদুল কাদের মোল্লা, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, কামরুজ্জামানসহ অনেক জামায়াত নেতা এই গণহত্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল।

আমরা মনে করি, স্বাধীনতার চল্লিশ বছরেও রাজাকারদের বিচার হয়নি। বঙ্গবন্ধু সরকারের সময় দালাল আইনে অনেক রাজাকার জেল খেটেছে। তবে রাঘববোয়ালরা সে সময় আত্মগোপন করে রক্ষা পেলেও আজ তারা বিচারের সম্মুখীন। এ ছাড়া স্বাধীনতার পরপর অনেক রাজাকারের তাৎক্ষণিক বিচার হয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষুব্ধ মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধারা ওদের শাস্তি দিয়েছে। '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর দুই রাজাকারের বিচার প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্যবানদের একজন আমি, যা আজও আমার স্মৃতিতে অমলিন।

তৎকালীন বরিশাল জেলার দক্ষিণাঞ্চলীয় থানা মঠবাড়িয়া। মঠবাড়িয়ার পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক থেকে নদীবেষ্টিত। দক্ষিণের নদীর ওপারে সুন্দরবন। সুন্দরবনের গভীরে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প। মেজর জিয়াউদ্দিন সুন্দরবন এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেছিলেন। ইচ্ছা করলে মুক্তিযোদ্ধারা খুব সহজেই মঠবাড়িয়ার নিয়ন্ত্রণ নিতে পারত। নিয়ন্ত্রণ নিতে গেলে সাধারণ মানুষ বেশি হতাহত হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

কারণ, থানার চারদিকেই সাধারণ মানুষের বসবাস, যার জন্য স্বাধীনতার নয় মাসই মঠবাড়িয়ার নিয়ন্ত্রণ ছিল রাজাকারদের হাতে। ঘাতক আবদুল জব্বার ইঞ্জিনিয়ারের (সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের ৫০ রাজাকারের তালিকার ৪১ নম্বরে যার নাম রয়েছে) নির্দেশে এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র গণপতি হালদারসহ অসংখ্য মানুষকে গুলি ও জবাই করে হত্যা করেছে কুখ্যাত রাজাকার হেমায়েত সুফি। সুন্নতি লেবাস পরা এই লোকটিকে দেখলে এলাকার শিশুরা পর্যন্ত আঁতকে উঠত।

১৯৭১ সালে আমি তখন ক্লাস সেভেনের ছাত্র। অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্কুলে যেতে হতো আমাদের। না গেলে রাজাকাররা বাড়ি থেকে ছাত্রদের ধরে আনত এবং অভিভাবকদের ওপর নির্যাতন করত। একদিন ইংরেজি শিক্ষক মোশাররফ স্যার আমার ওপর খুব অন্যায় করেছিলেন। স্কুলে অ্যাসেম্বলিতে জাতীয় সংগীত 'পাকসার জমিন' গাওয়া হতো। আমি লাইনে দাঁড়িয়ে মুখ বুজে ছিলাম, অন্য কারও সঙ্গে কণ্ঠ মিলাচ্ছিলাম না। আমাকে এ অবস্থা দেখে আমার ওই শিক্ষক এসে আমার গালে প্রচণ্ড থাপ্পর মেরেছিলেন। বলেছিলেন, 'জাতীয় সংগীত গাস না কেন?' আমি উত্তর দিইনি। শুধু মুখ বুজে সহ্য করেছিলাম। আমার এ অবস্থা দেখে তিনি আর কিছু না বলে চলে গিয়েছিলেন। এরপর থেকে যতবার 'আমার সোনার বাংলা' গাই অথবা শুনি, ততবারই পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত না গাওয়ার জন্য আমার শাস্তি পাওয়ার কথা মনে পড়ে। একাত্তরের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। ওই শিক্ষকের কথা মনে পড়ে, যিনি আমার শ্রদ্ধা হারিয়েছিলেন।

মঠবাড়িয়ার ব্যাংকপাড়ায় আমার বাসা হওয়ায় প্রায় প্রতিদিনই আমি রাজাকার হেমায়েত সুফির মুখোমুখি হয়েছি। যতবার তাকে দেখেছি, ততবার আমি মৃত্যুর প্রহর গুনেছি। ওই রাজাকারকে দেখলে আমার মুখ শুকিয়ে যেত। পা চলতে চাইত না। মনে হতো, এখনই বুঝি আমাকে গুলি করে মারা হবে!

কারণ এই রাজাকার করতে পারে না এমন কিছুই ছিল না। আমার প্রিয় কুকুরটাকে ওই রাজাকার গুলি করে হত্যা করেছে। কুকুরটা আমাকে স্কুলের একটা নির্দিষ্ট পথ এগিয়ে দিত। আবার বিকেল পাঁচটায় যখন বাসায় ফিরতাম, তখন দেখতাম কুকুরটি ওই জায়গায় আমার জন্য অপেক্ষা করছে। মাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি, আমি স্কুলে চলে গেলে কুকুরটি বাসায় ফিরে আসত। আবার আসার সময় ঠিক নির্দিষ্ট জায়গায় আমার জন্য অপেক্ষা করত। আমার সেই প্রিয় কুকুটিকে ওই রাজাকার হেমায়েত সুফি গুলি করে মেরেছে। এ কুকুরটির উল্লেখ আছে আমার ছোট ভাই জহিরুল ইসলামের 'কুয়াশা ঢাকা দিন' মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসে।

ডিসেম্বরের ৩ তারিখে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর বাবা বলছিলেন, মুক্তিযোদ্ধারা যেকোনো সময় থানা আক্রমণ করতে পারে। তাহলে আমরা ফায়ারিং রেঞ্জের মধ্যে পড়ে যাব। এই ভয়ে আমরা গ্রামের বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম। মঠবাড়িয়া থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে আমাদের গ্রামের বাড়ি।

গ্রামের বাড়িতে বসে আমরা বিবিসি ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনতাম। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই রেডিও সংবাদের মাধ্যমে আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাদের দিশেহারা হওয়ার খবর জানতে পারতাম। ষোলোই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ছয়টার সংবাদে বাংলাদেশ শত্রু মুক্ত হওয়ার খবর জানার সঙ্গে সঙ্গে আমরা মঠবাড়িয়ার উদ্দেশে রওনা হলাম। সেদিন বাবার হাত ধরে গ্রামের মেঠোপথ মাড়িয়ে পাঁচ কিলোমিটার পথ খুব দ্রুত পার হয়েছিলাম। আসার পথে আমাদের সঙ্গে গ্রামের আরও কিছু লোক ছিল। সেদিন সবার মুখে যে আনন্দ, যে উল্লাস লক্ষ করেছিলাম, ধীরে ধীরে তা ম্লান হয়ে যায় প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির মধ্যে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টির জন্য। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ার পর রাজাকাররা আবার রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে সাধারণ মানুষের স্বপ্ন ভেঙে যেতে শুরু করে।

সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে আমরা মঠবাড়িয়া বাজারে উপস্থিত হলাম। এসে দেখি আমাদের দেরি হয়ে গেছে। হাজার হাজার জড়ো হয়েছে বাজারে, জয় বাংলা স্লোগান দিচ্ছে তারা। মুক্তিযোদ্ধাদের তারা উৎসুক দৃষ্টিতে দেখছে। এ-ওর সঙ্গে কোলাকুলি করছে। সে এক আনন্দঘন দিন, যা কোনো দিনই ভোলোর নয়।

মঠবাড়িয়ার রাজাকাররা আত্মসমর্পণ করেছিল। তারা ভেবেছিল, আত্মসমর্পণ করলে তাদের কেউ কিছু বলবে না। অবাক করার বিষয় হলো, রাজাকার হেমায়েত সুফি সেই হাজার হাজার মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পরনে তার দীর্ঘ আলখাল্লা। মাথায় টুপি। পান চিবুচ্ছিল! হঠাৎ সেই ভিড়ের মধ্যে কে যেন বলে উঠল 'এই তো তো হেমায়েত সুফি!' এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষ কুখ্যাত রাজাকার হেমায়েত সুফিকে চর-ঘুষি ও লাথি দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। দু-এক মিনিটের মধ্যে মানুষের পায়ের নিচে পিষ্ট হয়ে মারা যায় কুখ্যাত রাজাকার হেমায়েত সুফি!
এরপর রাজাকাররা পালাতে শুরু করে। কিন্তু অনেকেই ধরা পড়ে যায়। হেমায়েত সুফি মারা যাওয়ার দিন বিকেলে মঠবাড়িয়া হাইস্কুল মাঠ লোকে লোকারণ্য। মাঠের মাঝখানে অত্যাচারী এক রাজাকারকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। এই রাজাকার স্থানীয় থানার একজন পুলিশ অফিসার ছিল। পদবি ও নামটা আজ আর মনে নেই। মঞ্চে উঠলেন মেজর জিয়াউদ্দিন। তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশে বললেন, 'আপনারা এই রাজাকারের কী শাস্তি চান?' জনতার মধ্য থেকে সমস্বরে ধ্বনি উঠল 'গুলি'। এ কথা শুনে ওই রাজাকার বেহুঁশ হয়ে ঢলে পড়েছিল। পরে তাকে হত্যা করেন মুক্তিযোদ্ধারা।

তিতলির পরি বন্ধু

জহিরুল ইসলাম

দুপুরের এই সময়টায় ঘুমাতে একটুও ভালো লাগে না তিতলির। তবুও প্রতিদিন দুপুরে খাওয়ার পর কিছুক্ষণ ঘুমায় ও। বাবা বলেন, এ সময়টায় ঘুমানো স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

তিতলিদের বাড়িটা দোতলা। আর দোতলার দক্ষিণ দিকের একটা ছোট্ট রুম তিতলির। সেই রুমের জানালার ধারের খাটটায় দিনের বেলা একা একা শুয়ে থাকতে তিতলির একটুও খারাপ লাগে না। কারণ ওদের বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গাটায় আছে এক বিরাট চালতা গাছ। সেই চালতা গাছে সারা দিন পাখিদের কিচিরমিচির লেগেই থাকে। দোয়েল, শালিক, কাক, টুনটুনি, ফিঙে, শ্যামা, বুলবুলি কত পাখি তার হিসাব নেই। প্রতিদিন দুপুরে তিতলি শুয়ে শুয়ে এসব পাখি দেখে। আর তাদের সঙ্গে মনে মনে কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ে।

আজও পাখিদের দেখতে দেখতে চোখ দুটো একসময় বুজে আসে তিতলির। এমন সময় দোয়েল পাখিটা এসে জানালার কাছে বসে। তার সঙ্গে সঙ্গে আরও আসে শালিক, কাক, টুনটুনি, ফিঙে, শ্যামা আর বুলবুলি। দোয়েলকে দেখে তিতলি বলে, কী ব্যাপার দোয়েল ভাইয়া, মন খারাপ নাকি?

দোয়েল বলে, হ্যাঁ তিতলি আপু, আমরা আজ তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি তো, তাই মনটা ভীষণ খারাপ।

তিতলি বলে, কেন কেন, তোমরা আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ কেন? তাহলে আমি একা একা থাকব কেমন করে?

শালিক পাখিটা বলে, আমরা তো যেতে চাইনি। কত দিন ধরে থাকছি তোমাদের এই চালতা গাছটায়। আর এখানে বসে রোজ রোজ তোমাকে দেখে দেখে তোমার সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে না আমাদের! কিন্তু কী করব বলো? ওই যে দেখো, কতগুলো লোক ইয়া বড় এক করাত নিয়ে এসেছে গাছটা কাটার জন্য। চালতা গাছটা কেটে ফেললে আমরা থাকব কোথায়, বলো? আমরা যে গাছপালা ছাড়া থাকতে পারি না।

এমন সময় কী একটা ঘড়ঘড় শব্দে তিতলির ঘুম যায় ভেঙে। চোখ খুলে জানালা দিয়ে তাকিয়ে ও দেখে, কতগুলো লোক লম্বা একটা করাত দিয়ে চালতা গাছটার গোড়া কেটে ফেলছে। গাছের ঘন পাতার মধ্যে পাখিগুলো সব অস্থির হয়ে কিচির-মিচির করছে আর ওড়াউড়ি করছে।

পরদিন দুপুরবেলা একইভাবে শুয়ে ছিল তিতলি। আজ ওর মন ভীষণ খারাপ। বিশাল চালতা গাছটার জায়গাটা ফাঁকা পড়ে রয়েছে। পাখিগুলো নেই। অনেকক্ষণ ধরে খালি জায়গাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখে পানি এসে যায়। একসময় চোখ বুজে আসে তিতলির।

এমন সময় আশ্চর্য রকম সুন্দর দুটি পাখি এসে প্রথমে তার জানালায় বসে। কিন্তু কী আশ্চর্য, জানালা দিয়ে ঢুকে পাখি দুটি সোজা তিতলির খাটের ওপর এসে বসে। আর বসেই দুটি সুন্দর মেয়ে হয়ে যায় তারা। মেয়ে দুটি তিতলির দুপাশে বসে। ডানদিকের মেয়েটি বলে, আমি লাল পরি আর ও নীল পরি। আর তুমি তিতলি, তোমাকে তো আমরা আগে থেকেই চিনি।

তিতলি এই প্রথম খেয়াল করে যে ওরা দুজন মানুষের মতো দেখতে হলেও ওদের দুটি করে ডানা আছে।

নীল পরি বলল, আমরা জানি আজ তোমার মন ভালো নেই। তাই তো আমরা তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। আমাদের সঙ্গে পরির রাজ্যে চলো, দেখবে তোমার মন ভালো হয়ে যাবে।

তিতলি বলে, তোমাদের রাজ্য, মানে পরিদের দেশ! সে তো আমি গল্পে পড়েছি। সেখানে আবার যাওয়া যায় নাকি? কোথায় তোমাদের দেশ?

সে অনেক অনেক দূরে। কোনো মানুষ সেখানে যেতে পারে না। তবে আমরা যদি কাউকে নিয়ে যাই, সে যেতে পারে। নীল পরি বলে।

আচ্ছা, তোমাদের না হয় ডানা আছে, উড়ে উড়ে যেতে পারবে। কিন্তু আমি কীভাবে যাব তোমাদের দেশে? তিতলি জিজ্ঞেস করে।

তুমি আমাদের পিঠের ওপর বসবে, আমরা উড়িয়ে নিয়ে যাব তোমাকে। হ্যাঁ, আর দেরি নয়, আম্মু টের পেয়ে গেলে কিন্তু আর যাওয়া হবে না।

আচ্ছা, চলো তাহলে।

তিতলিকে নিয়ে উড়ে চলল লাল পরি আর নীল পরি। উড়তে উড়তে মেঘেদের রাজ্য ছাড়িয়ে, তারাদের রাজ্য পেরিয়ে একসময় পরিদের রাজ্যে পৌঁছলো ওরা।

পরিদের রাজ্যে পৌঁছে তো অবাক তিতলি। এত সুন্দর কোনো দেশ থাকতে পারে! এত গাছ, এত ফুল, এত পাখি তিতলি জীবনেও দেখেনি। আনন্দে নাচতে ইচ্ছা হয় তিতলির। তিতলির মনের কথা বুঝতে পেরে লাল পরি বলে, কী, বললাম না, আমাদের দেশে গেলে তোমার মন ভালো হয়ে যাবে! এখানে তুমি মনের আনন্দে ঘুরতে পারো। পাখিদের সঙ্গে, ফুলদের সঙ্গে কথা বলতে পারো। দেখবে তোমার মন ভালো হয়ে গেছে।

একটু দূরে তাকাতেই তিতলি দেখতে পায় একটা নদী। হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধারে যায় ও। নদীর পানিতে একটুও ঢেউ নেই। নদীর পানি এত স্বচ্ছ আর নীল হতে পারে তা কোনো দিন ভাবতেও পারেনি ও। সে পানিতে লাল, নীল, হলুদ কত রঙের, কত বর্ণের মাছ যে ভেসে বেড়াচ্ছে তার হিসাব নেই। তিতলি বলে, বাহ, খুব সুন্দর তো তোমাদের দেশ! আচ্ছা, আমাদের পৃথিবী এ রকম সুন্দর হতে পারে না?

লাল পরি বলে, তোমাদের পৃথিবীও আগে এ রকমই ছিল। কিন্তু কিছু লোভী মানুষ গাছ কেটে কেটে, মাছ মেরে মেরে আজ এ অবস্থা করেছে সুন্দর পৃথিবীর। গাছ কাটার জন্য পাখিদের থাকার জায়গা নেই। তাই সব পাখি এখন এখানে চলে এসেছে। তোমাদের নদীর পানিতে ময়লা ফেলে এমন অবস্থা করেছে যে সেখানে মাছদের থাকার অবস্থা নেই। আর যা-ও ছিল, তা-ও তোমাদের মধ্যে কিছু মানুষ ডিমওয়ালা মাছ, পোনা মাছ মেরে শেষ করে দিচ্ছে। তাই তো তোমাদের নদীর পানি আজ নষ্ট হয়ে গেছে। সেখানে কোনো মাছ নেই।

কিন্তু সেই সুন্দর পৃথিবী আমরা আবার ফিরে পেতে পারি না? তিতলি জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ, ফিরে পেতে পারো। তোমাদের পৃথিবী আবার আমাদের এই পরির রাজ্যের মতো সুন্দর হতে পারে। তবে সে জন্য তোমাদের কিছু কষ্ট করতে হবে। গাছে গাছে ভরিয়ে তুলতে হবে তোমাদের পৃথিবীকে, যেন পাখিদের থাকার জায়গার অভাব না হয়। আর পাখি শিকার করা একদম চলবে না। নদী-পুকুর-খালের পানিকে পরিষ্কার রাখতে হবে। আর ছোট মাছ, ডিমওয়ালা মাছ মারা বন্ধ করতে হবে। তাহলেই দেখবে তোমাদের পৃথিবীও আবার সুন্দর হয়ে উঠবে।

পরিদের রাজ্যে ঘুরতে ঘুরতে ছোট্ট একটা পাখির দিকে চোখ পড়ে তিতলির। আরে, এ যে দেখছি সেই চালতা গাছের দোয়েল পাখিটা! এতক্ষণে খেয়াল হয় ওর, দোয়েল পাখিটাও কী যেন বলতে যাচ্ছে তিতলিকে।

এই যে দোয়েল ভাইয়া, তুমিও এখানে এসে পড়েছো! আর আমাদের চালতা গাছটার সেই শ্যামা, ফিঙে, শালিক, বুলবুলি-ওরা কোথায়? ওরাও কি এসেছে নাকি এখানে?

হ্যাঁ, ওরাও এসেছে এখানে। কিন্তু সত্যি কথা কি জানো তিতলি আপু, এখানে এত এত গাছপালা থাকতেও আমাদের কিন্তু একটুও ভালো লাগছিল না। তুমি নেই তো এখানে তাই। বলে দোয়েল পাখিটা।

তাহলে চলো, আমরা সবাই আবার সেখানে ফিরে যাই। তিতলি বলে।

দোয়েল বলে, তাহলে আমাদের থাকার জন্য, বাসা বানানোর জন্য একটা গাছ লাগিয়ে দাও তিতলি আপু, আমরা সবাই আবার আগের মতো আনন্দে থাকব সেখানে।

ঠিক আছে, আমি তোমাদের জন্য অনেকগুলো গাছ লাগিয়ে দেব। তখন কিন্তু তোমরা ফিরে আসবে।

এমন সময় আম্মু এসে তিতলিকে ডাকতে থাকেন, এই তিতলি, ওঠো ওঠো। কাল না তোমার জন্মদিন। মার্কেটে যেতে হবে। নতুন জামাকাপড় কিনতে হবে তোমার জন্য।

না আম্মু, জন্মদিনে আমার জামার দরকার নেই। আমাকে অনেকগুলো গাছের চারা কিনে দেবে। সেগুলো বড় হলে দোয়েল, শ্যামা, ফিঙে, বুলবুলি আরও কত পাখি বসবে সেখানে! জন্মদিনের কেক কাটার চেয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলতে আমার ভীষণ ভালো লাগবে। তিতলি বলে।

ঠিক আছে, জন্মদিনে অনেকগুলো গাছের চারাও উপহার দেব তোমাকে।

তিতলির চোখে তখন পরিদের দেশের ছবি ভেসে ওঠে।

রুবিনার ঈদ

তৌহিদ উল্লাহ শাকিল

ঈদের নতুন জামাকাপড় নিয়ে আলোচনা সবার তুঙ্গে। আমি নতুন ডিজাইনের ফতুয়া কিনব। সঙ্গে নতুন জুতা চাই।
আমারও চাই নতুন শার্ট, নতুন প্যান্ট।
হবে বাবা, তোমাদের দুজনের জন্যই হবে।
আচ্ছা আম্মু তুমি নতুন কাপড় কিনবে না? বলে উঠল সাগর।
হ্যাঁ বাবা কিনব। তোমার দাদুকেও নতুন কাপড় কিনে দেব।
আম্মু তুমি খুব লক্ষ্মী। এবার বলে উঠল সুমন।

সাগর এবং সুমন দুই ভাই। তাদের বাবা আসলাম সাহেব দুবাই থাকেন। সেখানে একটি পানি সাপ্লাই কোম্পানিতে কাজ করেন। প্রতি দুই বছর অন্তর তিনি দেশে আসেন। তখন সাগর এবং সুমন খুব খুশি হয়। বাবা তাদের জন্য নানা জিনিস নিয়ে আসেন। সাগরের বয়স আট বছর সুমনের ছয়। তাদের মা রুবিনা প্রাণচঞ্চল মহিলা। সব সময় হাসিখুশিতে থাকেন। স্বামী-সংসার নিয়ে ভালো আছেন। তবে আসলাম সাহেব যখন দেশের বাইরে থাকেন , তখন তার বেশ খারাপ লাগে। কিন্তু কী করবেন , এ ছাড়া তো করার কিছু নেই। সামনে ঈদ। ঈদের জন্য অনেক খরচ, সেই খরচের জন্য দরকার টাকা।

রুবিনা গতকাল ব্যাংকে গিয়েছেন , টাকা এখন আসেনি। আসলাম বলেছে , যথাশিগগির টাকা পাঠাবে। ছেলেগুলো ঈদের কাপড়ের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। রুবিনার শ্বশুর বৃদ্ধ মানুষ। তার পরও সংসারের অনেক কিছুই তিনি দেখাশোনা করেন।

ঈদের মাত্র দুদিন বাকি। এখন আসলামের টাকা আসেনি। রুবিনা পাশের বাড়ির চাচার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে ঈদের বাজার করতে গেল। নিজের এবং ছেলেদের এবং বৃদ্ধ শ্বশুরের জন্য কাপড় কিনে আনলেন। এর আগেও বেশ কয়েকবার টাকা আসতে দেরি হলে ধার নিয়েছে রুবিনা।

আজ ঈদের দিন। সকাল থেকে রুবিনার মন খারাপ। গতকাল রাতে কেন জানি খুব কষ্ট অনুভূত হয়েছে বুকের মাঝে। কেমন জানি একটা ভয় লাগছে, নিজের কাছে। এমন সময় ফোন বেজে উঠল রিং রিং শব্দে।

বিদেশি নম্বর দেখে খুশিমনে ফোন ধরলেন। কিন্তু যা শুনলেন , তাতে ধপাস করে মাটিতে বসে পড়লেন মাথায় হাত দিয়ে। সাগর এবং সুমন এসে মাকে এভাবে বসে থাকতে দেখে বলে উঠল

মা। নতুন কাপড় দাও। ঈদের নামাজে যামু।

রুবিনা কী করবে বুঝতে পারছে না। আসলাম গতকাল রাতে গাড়ি করে পানি দিয়ে আসার সময় রাস্তায় অ্যাকসিডেন্ট করে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। ছেলেদের ঈদের আনন্দ করতে দেবেন নাকি তাদের বাবার দুঃসংবাদ দেবেন, সে নিয়ে দোটানায় ভাবতে লাগলেন।

ঈদের আনন্দ

আমিনুর রহমান

পছন্দের ক্ষেত্রে আমি সব সময়ই খুঁতখুঁতে। কোনো কিছু কেনার জন্য মার্কেটে গেলে সব দোকান ঘুরে যে জিনিসটাকে দেখলে মনে হয় সেটি শুধু আমার জন্যই তৈরি করা হয়েছে, সেটি কিনি। আমার বন্ধুরা যারা কোনো দিন অন্তত একবার আমার সঙ্গে মার্কেটে গেছে তারা আর কখনো আমার সঙ্গে যেতে চায় না। তাই প্রায়ই আমাকে একাই যেতে হয়। সেদিনও একাই গিয়েছিলাম। সেদিন? হ্যাঁ। গত বছর। তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে থাকি।

ঈদুল ফিতরের আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। বাসা থেকে মা কিছু টাকা পাঠিয়েছেন। এর মধ্য থেকে যেন আমাদের বাসার কাজের মেয়েটার জন্য একটা জামা কিনি আর বাকিটা আমার।

শুনেছি ঈদের সময় নাকি গরিবদের জন্য বন্দর বাজারের ফুটপাতে রমরমা ব্যবসা হয়। ভাবলাম কাজের মেয়েটার জন্য আগে সেখান থেকে একটা জামা কিনে তারপর জিন্দাবাজার থেকে আমারটা কিনব।

সেদিন একটা দোকানে গিয়ে কাজের মেয়েটার জন্য জামা দেখছি। এমন সময় 'মাত্র ১০ টাকার জন্য জামাটা দেবেন না' কথাটা কোথায় থেকে যেন কানের মধ্যে এসে পড়ল। আমি একটু ঘুরে তাকিয়ে দেখি, একজন ভদ্রমহিলা একটি জামা হাতে নিয়ে দর-কষাকষি করছেন। তাঁর সঙ্গে দুটি মেয়ে। একজনের বয়স হবে ১৫-১৬। অন্য জনের সাত-আট। বুঝলাম ভদ্রমহিলাটি তার ছোট মেয়ের জন্য দর-কষাকষি করছেন। দোকানদার বলল, 'এই ১০ টাকাই আমার লাভ হবে। তার কমে আমি দিতে পারব না।' মহিলাটি হঠাৎ একটু রেগে গিয়ে বললেন, 'বললাম তো আমার কাছে আর কোনো টাকা নেই। থাকলে কি আর আপনার সঙ্গে এত কথা বলতাম।' দোকানদার তবুও অনড়।

মা দুই মেয়েকে নিয়ে চলে যেতে চাইলেন। কিন্তু ছোট মেয়েটি জামা ছাড়া কিছুতেই যাবে না। মেয়ের জেদ দেখে মা রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে মেয়ের গালে গুটি কয়েক চড় বসিয়ে দিলেন। মারের ভয়ে মেয়েটি জামা রেখে দিলেও কান্না থামাল না। এত লোকের সামনে চিৎকার করে কাঁদলে কেমন দেখায় হয়তো সে জন্যই সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আমার মনটা ভিজে গেল। পকেট থেকে টাকা বের করে দোকানদারকে বললাম, ১০ টাকা আমি দিচ্ছি। আপনি ওই টাকাতেই তাদের জামাটি দিয়ে দেন।

কিন্তু কী আশ্চর্য! দোকানদার রাজি হলেও ভদ্রমহিলাটি রাজি হলেন না। আমার প্রস্তাবে যে তাদের আত্মসম্মানে লাগতে পারে তা মোটেও ভাবিনি। পরে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে টাকাটা আমি কিছু মনে করে দিচ্ছি না। কিন্তু কোনোভাবেই তাঁকে বোঝাতে পারলাম না। তারপর তিনি তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে চলে গেলেন। দোকানদারও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আমার কাছে মনে হলো আমি তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে হেরে গেছি। হঠাৎ দোকানদার বলল, 'ভাই সমস্যা নেই, তারা আবার আসবে।' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আবার আসবে মানে!' তখন দোকানদার বলল, 'আমরা ক্রেতাদের চেহারার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারি কার কোন জিনিসটা পছন্দ হয়েছে এবং কে কোনটা নেবে।' আমার কাছে মনে হলো হয়তো তারা তাদের আত্মসম্মানের জন্যই আবার আসবে।

তারপর আমি আমাদের কাজের মেয়েটার জন্য একটা জামা কিনে সেখান থেকে চলে এলাম। বিষন্ন একটা মন নিয়ে জিন্দাবাজারে একের পর এক দোকান ঘুরছি কিন্তু কোনো জিনিসই আর আমার পছন্দ হচ্ছে না এবং নিজেকে খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। মনে হচ্ছে কী যেন নেই। ঠিক এমন সময় সাত-আট বছরের এক টোকাই পেছনে লেগেছে। 'স্যার দুইডা টেকা', 'স্যার দুইডা টেকা'। এই টোকাইদের নিয়ে এক সমস্যা। একবার পিছু লাগলে আর ছাড়ে না। যেইমাত্র টোকাইকে দুই টাকা দিতে যাব, তখনই ফাঁকা ফাঁকা লাগার কারণটা বুঝতে পারলাম। কাজের মেয়েটার জন্য যে জামাটা কিনেছিলাম, সেটি নেই। তাড়াতাড়ি টোকাইকে বিদায় করে দৌড় দিলাম বন্দর বাজারের দিকে। দোকানদারকে বললাম, ভাই আপনার দোকানে মনে হয় আমার জামাটি ফেলে গেছি। দোকানদার কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে, আপনি তো জামাটা না নিয়েই চলে গেলেন বলে জামাটা বের করে দিলেন। জামাটা নিয়ে চলে আসব এমন সময় আবার ভদ্রমহিলাটিকে দেখলাম দোকানে আসছেন। এবার তার সঙ্গে শুধু ছোট মেয়েটি। মেয়েটির গাল বেয়ে যে চোখের পানি পড়েছিল, সেগুলোর দাগ এখনো রয়ে গেছে। মহিলাটি এবার পুরো টাকা দিয়েই জামাটা কিনে যেইমাত্র মেয়েটির হাতে দিলেন, তখনই মেয়েটির মুখের শেপ পরিবর্তন হয়ে গেল। সাদা সাদা দাঁতগুলো বের করে এত সুন্দর, এত নির্মল একটা হাসি দিল যে হাসিতে নেই কোনো কৃত্রিমতা, নেই কোনো রাগ কিংবা অভিমানের ছোঁয়া। তবে হ্যাঁ, সেই হাসির মধ্যেও মেয়েটির গালে চোখের পানির দাগগুলো দেখা যাচ্ছে। এ যে কত সাধনার ধন, তা মেয়েটি খুব ভালো করেই জানে। আমার কাছে মনে হলো কত দিন ধরে এমন নিষ্পাপ একটা হাসি দেখি না।

তারপর তাঁরা চলে যাওয়ার পরও বেশ কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন আমার মনে হলো, আমিও তো জামা কিনব। কিন্তু আমি কি মেয়েটির মতো এতটা খুশি হতে পারব? আসলে মানুষ যত ওপরের দিকে ওঠে, ততই তার খুশি হওয়ার ক্ষেত্রগুলো কমতে থাকে।

বিষন্ন একটা মন নিয়ে আবার রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। এমন সময় শুরু হলো বৃষ্টি। সিলেটের বৃষ্টি কখন নামে বোঝা বড়ই দায়। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি মাথায় নিয়েই হাঁটছি। আবারও একই সমস্যা। টোকাই। এই দিকটায় টোকাইদের উৎপাত একটু বেশি। এবার একজন নয়, দুজন। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে তাদের দেখছি। একজন একটু মোটা হলেও অন্য জন রোগা। রোগা ছেলেটাকে দেখে বয়স আন্দাজ করা খুবই কঠিন। দুজনের গায়েই ময়লা জামাকাপড়।

রোগা ছেলেটার শার্টের কোনো বোতাম নেই এবং প্যান্টটা প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশি লম্বা। আর মোটা ছেলেটার কাপড়ের মাপ ঠিক থাকলেও ময়লা জমে কাপড়ের রং পরিবর্তন হয়ে গেছে। দুজনেরই দাবি, 'দুই টাকা।'

তখন আমার মনে হলো আমি চাইলেই তো তাদের দাবিগুলো মিটিয়ে দিতে পারি। শুধু দাবি কেন, তাদের প্রত্যাশার চেয়েও বেশি কিছু দিতে পারি। আচ্ছা, তাদের যদি দুটি জামা কিনে দিই, তাহলে তারাও কি ওই মেয়েটির মতোই খুশি হবে? চেষ্টা করে দেখা যাক। তাদের বললাম তোমাদের দুটি জামা কিনে দেব। কার কী পছন্দ? রোগা ছেলেটা বলল, 'লাল শার্ট' আর মোটা ছেলেটা বলল, 'লাল গঞ্জি'। বুঝলাম লাল রংটা তাদের খুব পছন্দ। তাদের নিয়ে আবার সেই দোকানটিতে গেলাম। দুজনকে তাদের পছন্দমতো দুটি জামা কিনে দিয়ে যখন দোকান থেকে বের হলাম, তখনই আমার চোখ দুটি কপালে উঠল। বাইরে অনেক টোকাই দাঁড়িয়ে। সবাই আমাকে ঘিরে ধরল। সবার দাবি লাল শার্ট। তখন বুঝতে পারলাম, আমি যখন টোকাই দুটিকে নিয়ে দোকানে আসি তখনই এরা দূর থেকে দেখেছে এবং আমার পিছু নিয়েছে। কিন্তু এতগুলো টোকাইকে যদি জামা কিনে দিই, তাহলে তো এবার ঈদে আর আমার কিছু কেনা হবে না।

কী করব ভাবছি। টোকাইগুলো যেভাবে আমার পিছু নিয়েছে, মনে হয় না এত সহজে ছাড়া পাব। তারপর সবাইকে ১০ টাকা করে দিয়ে সে যাত্রায় বেঁচে গেলাম।

অশ্রুস্নাত ঈদ

সাইফ সাইমুম

বাসস্ট্যান্ডে নেমে দুদিকে তাকাল মাসুম। কিন্তু কোনো রিকশা কিংবা ভ্যান চোখে পড়ল না। একটু অপেক্ষা করেই হাঁটা ধরল খেয়াঘাটের দিকে। খেয়াঘাটে পৌঁছেই দেখল আয়নাল মাঝি তার ডিঙি নিয়ে বসে আছে যাত্রীর অপেক্ষায়। আসসালামু আলাইকুম আয়নাল চাচা। কেমন আছেন?

-ওয়ালাইকুম সালাম। আরে আমাদের মাসুম যে! আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছো, বাবা?
-এই তো চাচা আপনাদের দোয়ায় ভালো।
-তা এত দিন পরে বাড়ির কথা মনে পড়ল বুঝি! যা হোক, বাড়িতে যাবে তো? ব্যাগগুলো আমার হাতে দিয়ে নৌকায় উঠে বসো। তোমাদের বাড়ির ঘাটে তোমাকে নামিয়ে দিয়ে এসে আমিও বাড়িতে যাব। ইফতারের সময় হয়ে যাচ্ছে।

আয়নাল মাঝির হাতে প্রথমে শপিংব্যাগগুলো দিল মাসুম। তারপর সেও নৌকায় উঠ বসল। চলতে শুরু করল ডিঙি। তা চাচা গ্রামের খবর কী?
-গ্রামের খবর ভালো। তা বাবা তোমার খবর বলো এবার। গ্রামে তো এলে পাঁচ মাস পর। শুনেছি ঢাকায় নাকি বড় চাকরি পাইছো। অনেক টাকা বেতন?
-হ্যাঁ, চাচা। আপনাদের দোয়ায় ঢাকায় ভালো একটা চাকরি পেয়েছি। নতুন চাকরি তো, তাই কাজের চাপে অনেক দিন বাড়িতে আসা হয় না।
-শুনে খুশি হলাম বাবা। তোমার মায়ের কষ্টটা এবার সার্থক হলো। তোমার বাপ মারা যাওয়ার পর তোমার মা কত কষ্ট করে তোমাকে লেখাপড়া করাল সে তো আমরা ভালো করে জানি। আহারে তোমাদের কী কষ্টের দিনগুলোই না গেছে! এভাবে কথা বলতে বলতে ডিঙি পৌঁছে গেল মাসুমদের বাড়ির ঘাটে।
-যাও বাবা। এবার নামো। আমি ব্যাগগুলো তোমার হাতে দিচ্ছি।
-মাসুম নেমে মানিব্যাগ বের করে আয়নাল মাঝির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ব্যাগগুলো নিয়ে বাড়ির উঠানে গিয়েই ডাক দিল-মা, রুনু, রাসেল তোমরা কোথায়? দেখ আমি এসেছি।

রুনু আর রাসেল মাসুমের ছোট দুই ভাইবোন। দুজনে যথাক্রমে ক্লাস সিক্স আর এইটে পড়ে। তিনজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল মাসুমের ডাক শুনে। ভাইয়া এসেছে, ভাইয়া এসেছে বলে রুনু আর রাসেল দৌড়ে এল। আর কারীমা খাতুন এসেই ছেলের হাত থেকে সব ব্যাগ নিয়ে বললেন-পথে কোনো সমস্যা হয়নি তো বাবা?
-না, মা। তোমার দোয়ায় কোনো সমস্যা হয়নি পথে।

তারপর সবার সঙ্গে কুশল বিনিময়ের পর কারীমা খাতুন বললেন-যা বাবা স্নানঘরে পানি রাখা আছে। তুই গোসল করে আয়। এদিকে ইফতারের টাইমও হয়ে এল। আমি ইফতার তৈরি করি।

গোসল করে এসে ঘরে বসার পর মা ডাকলেন মাসুমকে-মাসুম বৈঠকঘরে চলে আয়। ইফতার রেডি। আজানেরও সময় হয়ে এল।
-আসছি মা, বলে বৈঠকঘরে গেল মাসুম। গিয়ে দেখল সবাই বসে আছে মাদুর বিছিয়ে ইফতার সামনে নিয়ে।
-আয় বাবা। বসে পড়। মাসুম বসল।
-আচ্ছা, মা। কাল কী ঈদ হবে?
- আজ তো ঊনত্রিশ রমজান। তাই চাঁদ দেখা গেলেই কাল ঈদ হবে।
-শোনো মা, আমি এবার তোমাদের ঢাকায় নিয়ে যাব। আমি ভালো চাকরি যেহেতু পেয়েছি, এখন আর তোমাদের ছেড়ে ঢাকায় একা থাকতে পারব না। আমি একটা বাসা দেখে এসেছি তোমাদের নিয়ে যাব বলে। ওখানে গিয়ে রুনু আর রাসেলকে ভালো স্কুলে ভর্তি করে দেব।
-কিন্তু বাবা এই বাড়ি, ঘর কে দেখবে? তোর বাবার কত স্মৃতি এখানে।
-মা, আমরা তো একেবারে চলে যাচ্ছি না। মাঝেমধ্যে আসব। আর বাড়িতে আমাদের রুবিনা ফুফুকে রেখে যাব। উনার তো কেউ নেই আমরা ছাড়া। উনি বাড়িঘর দেখাশোনা করবেন আর মাসে মাসে কিছু টাকাও পাঠাব উনার জন্য।
-আচ্ছা সে দেখা যাবে। বলতেই আজান হয়ে গেল। নে বাবা, এবার ইফতার কর। আজান হয়ে গেল।

ইফতার শেষ হওয়ার পর মাসুম মা আর ছোট দুই ভাইবোনকে ঈদের জন্য কিনে আনা জামা-জুতো দিল। নতুন দামি জামা-জুতা পেয়ে সবাই খুশি হলো। এরপর রুনু আর রাসেল গেল ঈদের চাঁদ উঠেছে কি না দেখতে। এমন সময় মাসুমের মোবাইল বেজে উঠল। রিসিভ করার পর ওপাশের কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল মাসুম। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। চিৎকার শুনে মা-ও ছুটে এলেন।
-কী হয়েছে, বাবা। কার সঙ্গে কথা বলে চিৎকার করে উঠলি?
-না, মা। আমার এক সহকর্মী অ্যাকসিডেন্ট করেছে তো। গুরুতর অবস্থা। তাই খবরটা শুনে চিৎকার করে উঠলাম। মা, আমি একটু বাজার থেকে ঘুরে আসি।
-কেন বাবা। এই টাইমে বাজারে গিয়ে কী করবি?
-না, মা এমনিতেই। অনেক দিন পর গ্রামে এলাম তো। সবার সঙ্গে দেখাটেখা করে আসি।
-আচ্ছা, বাবা। সাবধানে যাস। এমন সময় রুনু আর রাসেল এসে বলল-মা, ভাইয়া ঈদের চাঁদ দেখা গেছে। কাল ঈদ।
-তাহলে তো ভালোই, বলল মাসুম। আচ্ছা, মা আমি আসি। তারপর সে চলে গেল বাজারের দিকে।

বাজার থেকে অনেক খরচাপাতি নিয়ে এল রাত ১০টায়। খরচগুলো মায়ের হাতে দিয়ে বলল মা, আমি ক্লান্ত। তাই এখন ঘুমিয়ে পড়ি।
আচ্ছা, বাবা যা ঘুমিয়ে পড়। তোর বিছানা রেডি করা আছে। সকালে উঠে ঈদের নামাজ পড়তে যেতে হবে তো। এরপর বিছানায় গিয়ে পড়তেই দুচোখ ঘুমে বুজে এল মাসুমের।

রাত একটা। পুরো গ্রাম নিস্তব্ধ। হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল মাসুমের। অনেকক্ষণ ধরে টোকানোর ফলে ঘুম ভেঙে গেল মাসুমের।
-কে? কে দরজায় টোকা দেয়?
-আমরা পুলিশের লোক। আপনার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট আছে। পুলিশ আপনার বাড়ির চারপাশ ঘিরে রেখেছে। আপনি বেরিয়ে আসুন।
-যা বোঝার বুঝে গেল মাসুম। বেরিয়ে এল দরজা খুলে।
-সেন্ট্রি, হ্যান্ডকাফ লাগাও। ওসির কথামতো কাজ করল সেন্ট্রি।
ওদিকে শব্দ শুনে কারীমা খাতুনও তার দুই ছোট ছেলেমেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। এসে মাসুমকে হাতকড়া পরা অবস্থায় দেখে বললেন, কী করেছে আমার মাসুম। কেন আপনারা ওকে নিয়ে যাচ্ছেন।
-আপনি কি ওর মা? জিজ্ঞেস করলেন পুলিশ অফিসার।
-হ্যাঁ, আমি ওর মা।
-আপনার ছেলে ঢাকার একজন মাদক ব্যবসায়ী। ঢাকায় আজ সন্ধ্যায় ওর সহযোগী ধরা পড়েছে। সে-ই আপনাদের ঠিকানা বলে দিয়েছে। ওকে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর আর কোনো উপায় নেই।
-মাসুম, বাবা আমার। ওরা কী বলছে বাবা? তুই না ঢাকায় চাকরি করিস। তাহলে ওরা তোকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কেন? বলেই কেঁদে ফেললেন কারীমা খাতুন। সঙ্গে কান্না শুরু করে দিল রুনু আর রাসেলও।
-মা শোনো, গরিবের চাকরি নেই এই দেশে। কত ভালো রেজাল্ট করে পাস করলাম। তারপর কত জায়গায় ইন্টারভিউ দিলাম। কিন্তু ঘুষ ছাড়া কেউই চাকরি দিল না। এদিকে তোমার কষ্ট দেখে আমার আর ভালো লাগছিল না। তাই বাধ্য হয়েই..ওসি সাহেব চলুন। বলে হাঁটা ধরল সে। পেছন পেছন হাঁটতে থাকল পুলিশের একটি বহর। তারও পেছনে অশ্রুস্নাত চোখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তিনটি মানুষ। যারা ঘটনার আকস্মিকতায় এতই নির্বাক যে, শব্দ করতেও যে ভুলে গেছে।

একটি

প্রথম আলো ব্লগ

প্রকাশনা

প্রথম আলো ব্লগ

ঈদ সংখ্যা ২০১১